অধ্যায় এক ঃ ব্যবস্থাপনা

- অধিবেশন ১.১ ঃ ব্যবস্থাপনা **(Management)**
- অধিবেশন ১.২ ঃ সহায়ক/কার্যকর তত্ত্বাবধান**(Supportive/Effective Supervision)**
- অধিবেশন১.৩ ঃ ব্যবস্থাপকের/তত্ত্বাবধায়ক এর দক্ষতা ও ভূমিকা**(Skills & Role of a Manager)**
- অধিবেশন১.৪ ঃ পরিকল্পনা **(Planning)**
- অধিবেশন১.৫ ঃ মানসম্মত সার্বিক ব্যবস্থাপনা **(Total Quality Management)**
- অধিবেশন১.৬ ঃ সময় ব্যবস্থাপনা **(Time Management)**
- অধিবেশন১.৭ ঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ **(Decision Making)**

হ্যান্ডআউট ১.১ ঃ ব্যবস্থাপনা (Management)

ব্যবস্থাপক যা করেন তাই ব্যবস্থাপনা। ব্যবস্থাপক নিজ হাতে কাজ করেন না, তার কাজ হলো অন্যের দ্বারা কাজ করিয়ে নেয়া। একজন ব্যবস্থাপককে অন্যের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে হলে তাকেও কিছু কাজ করতে হয়। এ কাজগুলোকেই ব্যবস্থাপনা নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

ব্যবস্থাপনা হলো পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত উপকরণসমূহের যথাযথ ব্যবহারের প্রক্রিয়া। পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নির্দেশনা, উদ্বুদ্ধকরণ, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ, এ প্রক্রিয়া বা কৌশলের আওতাধীন।

ব্যবস্থাপনা হল কর্মীদের সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের কার্যসম্পাদন করার কৌশলগত পদ্ধতি। ব্যবস্থাপনা একটি প্রক্রিয়া। বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবস্থাপনার কার্যাবলীকে দু'ভাগে আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন-

ক) প্রশাসনিক কার্যাবলী : পরিকল্পনা ও সংগঠনের কাজ এর অন্তর্ভুক্ত। এটা ধারণা ও চিন্তামূলক (*thinking*)কার্যকলাপের সমষ্টি।

খ) সম্পাদনার কার্যাবলী : আদেশদান, নির্দেশদান, অনুপ্রাণিতকরণ, উদ্বুদ্ধকরণ,সংযোজনা, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কার্যকলাপ, এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলো বাস্তবে ক্রিয়াগত *(doing)*কার্যাবলী।

ব্যবস্থাপনার স্তর *(Levels of Management)*

ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যবালী সামগ্রীকভাবে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া নামে পরিচিত। এ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়কে ব্যবস্থাপনার স্তর বলে। ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কাজ বিভিন্ন স্তরে *(levels)* সম্পাদিত হয় এবং বিভিন্ন ব্যবস্থাপক ও কর্মীর মধ্যে নির্দিষ্ট স্তরক্রম *(hierachy)*থাকে।

প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী। সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার স্বার্থেই ব্যবস্থাপনার কাজগুলো বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে দেয়া হয়। এই স্তরগুলো এবং এগুলো সংশ্লিষ্ট কাজ নিচে আলোচনা করা হল-

১. **উঁচু পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা *(Top Level management)* :** এ স্তরের ব্যবস্থাপকরা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, সাংগঠনিক উন্নয়ন কৌশল তৈরি ও পর্যবেক্ষণমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত। এ স্তর প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ স্তরের নির্বাহীদের নিয়ে গঠিত। প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ, চেয়ারম্যান, সেক্রেটারী, মহা ব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপক, পরিচালক, প্রমুখদের নিয়ে ব্যবস্থাপনার উঁচু স্তর। উচু পর্যায়ে ব্যবস্থাপকদের কাজগুলো নিচে দেয়া হল-
   ক) প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন;
   খ) উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কৌশলগত পরিকল্পনার মাধ্যমে পারিপার্শ্বিক প্রতিক্রিয়া মোকাবেলা;
   গ) সামগ্রিক নের্তৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনায় সজীবতা আনয়ন;
   ঘ) প্রতিষ্ঠানকে একটা সার্বিক পদ্ধতি (*total system*) হিসেবে গঠন করার জন্যে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কাজের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান;
   ঙ) প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের কার্য মূল্যায়ন;

চ) প্রতিষ্ঠানের বাজেট অনুমোদন;
ছ) বিভিন্ন বিভাগের পরিকল্পনা গঠনে নেতৃত্বদান এবং ব্যবস্থাপকদের মধ্যে কার্যভার বন্টন;
জ) সরকার ও বিভিন্ন বহিঃপক্ষের সাথে প্রতিষ্ঠানের নীতি সম্পর্কে আলোচনা ।

২. **মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা *(Middle level management)* :**মধ্যমস্তরের ব্যবস্থাপকরা ব্যবস্থাপনার উঁচু পর্যায়ে গৃহীত পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত। এ স্তর বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে গঠিত। উপ পরিচালক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রকল্প কর্মকর্তা, অর্থ ব্যবস্থাপক, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপক প্রমুখদের নিয়ে ব্যবস্থাপনার মধ্যম স্তর। মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের কাজগুলো নিচে দেয়া হল-

ক) উঁচু পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
খ) উঁচু পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের কাছ থেকে নির্দেশনা নেয়া এবং সে অনুযায়ী নিচু পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের আদেশ দান;
গ) নিজ নিজ বিভাগের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে উঁচু পর্যায়ের ব্যবস্থাপনাকে নিয়মিত অবহিতকরণ;
ঘ) বিভাগীয় কাজ তদারকী এবং বিভাগীয় কাজ ও ব্যক্তির কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
ঙ) বিভাগীয় পরিকল্পনা, নিয়োগ, উদ্বুদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ;
চ) উপকরণ এবং উৎপাদনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তাদান;
ছ) উঁচু পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা ও নিচু পর্যায়ের ব্যবস্থাপনার মধ্যে সংযোগসাধন;
জ) একটি পরিতুষ্ট এবং দক্ষ কর্মীবাহিনী সৃষ্টি।

৩. **নিচু পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা *(Lower level management)* :**এস্তরের ব্যবস্থাপকরা শ্রমিক কর্মীদের কাজ তদারকীর সাথে সম্পৃক্ত। ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে নিম্নস্তরে এদের অবস্থান। এটাকে ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক স্তরও বলা হয়। ফোরম্যান, সুপারভাইজর, সুপারিন্টেনডেন্ট, প্রধান করণিক, ইউনিট প্রধান প্রমুখদের নিয়ে ব্যবস্থাপনার নিচু স্তর। নিচু পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের কাজগুলো নিচে দেয়া হল-

ক) উর্ধ্বতন স্তরে নিযুক্ত ব্যবস্থাপকদের আদেশ, নির্দেশ, নীতি ব্যবস্থাপনার নিচু পর্যায়ে নিযুক্ত কর্মীদের মাধ্যমে বাস্তবে রূপদান;
খ) নিজ নিজ বিভাগের কর্মীদের কাজ শেখানোর ব্যবস্থা এবং তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তাদান;
গ) কারিগরি দক্ষতার মাধ্যমে কর্মীদের সাহায্য প্রদান;
ঘ) দৈনন্দিন কার্যসূচি প্রণয়ন, কর্মীদের মধ্যে কাজ বন্টন, তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ ও কাজের মূল্যায়ন;
ঙ) শ্রমিক/কর্মী এবং মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ সম্পাদন;
চ) কাজের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি, শ্রমিক/কর্মীদের নিরাপত্তা ও কল্যানকর কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ।

ব্যবস্থাপনার নীতি *(Principles of Management)*

নীতি হচ্ছে এমন কতগুলো মৌলিক সত্যি অথবা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে সত্যি, যা দুই বা ততোধিক বিষয়বস্তু এর মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে।

নীতিকে এমন মৌলিক বিবরণী বা সত্যাশ্রিত বিবরণী বলা যায় যা চিন্তা ও কাজের পথ নির্দেশ করে। যখন নীতি প্রয়োগ করা হয় তখন কী ধরনের ফল প্রত্যাশা করা হয় তা নীতির মাধ্যমে জানা যায়।

ব্যবস্থাপনা হল কতিপয় কাজের সমষ্টি যা প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা তৈরি করে, প্রতিষ্ঠানের পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যে মানুষ ও অন্যান্য বস্তুগত সম্পদ সংগ্রহ করে কার্য সম্পাদনে সেগুলো ব্যবহার করে ও কাজে নিযুক্ত কর্মীদের নির্দেশনা, সমন্বয়সাধন ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে তাদের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যবস্থাপনা একটি সুসমন্বিত প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়াকে দিক নির্দেশনা দেয়ার নিয়মাবলীকে ব্যবস্থাপনার নীতি বলে। ব্যবস্থাপনার নীতির প্রবক্তাদের মধ্যে হেনরী ফেয়ল ১৪টি, এফ. ডব্লিয় টেলর ৫টি, এল আরউইক ৭টি, জে. মার্টিন্ডেল ১১টিতে নীতির কথা বলেছেন। এর মধ্যে হেনরী ফেয়ল কর্তৃক প্রদত্ত নীতিগুলো ব্যাপকভিত্তিক প্রয়োগযোগ্যতার কারণে সারা বিশ্বে সর্বজনীন স্বীকৃতি পায়। নীচে এ নীতিগুলো আলোচনা করা হলো :

১. কর্ম বিভাজন *(Division of work)* : উৎপাদনের প্রত্যেক স্তরে শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের কাজগুলোকে প্রথমে শ্রেণিবিন্যাসকরণ ও পরে এ শ্রেণীবিন্যাসকৃত কাজগুলোকে কর্মীদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে তাদের মধ্যে বন্টন করে দেয়াকে শ্রমবিভাগ বলে। এটা কর্মীদেরকে দক্ষ ও বিশেষায়িত জ্ঞান অর্জনের সাহায্য করে এবং প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত কর্ম সম্পাদন বৃদ্ধি করে ক্ষমতার পৃথকীকরণ (separation of power) ঘটায় ও প্রতিষ্ঠানে সফলতা আনয়ন করে।

২. কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব *(Authority and responsibility)*: কর্তৃত্ব হচ্ছে এক ধরনের অধিকার. যা অর্জনের মাধ্যমে কর্মী নিজে কাজ করার অধিকারপ্রাপ্ত হয় এবং অধঃস্তন কর্মীকে আদেশদান ও কাজে বাধ্য করার ক্ষমতা অর্জন করে। ক্ষমতা অর্জনের বিনিময়ে অধঃস্তন কর্মী তার নিজের কর্তব্যভার পালনের হিসেব উর্ধ্বতন কর্মীকে দিয়ে থাকেন। তার মধ্যে এ কর্তব্যবোধ গড়ে ওঠার অর্থ হল দায়িত্ববোধ। যথাযথ কর্তৃত্ব ছাড়া যেমন কোন দায়িত্ব পালন করা যায় না তেমনি কাউকে দায়িত্ব অর্পন না করে কেবলমাত্র কর্তৃত্ব অর্পণ করলে সে ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে কিংবা স্বৈরাচারী হয়ে ওঠতে পারে। সুতরাং কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সমানুপাতিকহওয়া উচিত।

৩. শৃঙ্খলা *(Discipline)* :যখন ব্যবস্থাপক ও কর্মীরা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে, একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ও পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে সম্পাদিত চুক্তি মেনে চলে, তখন প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা বজায় থাকে। শৃঙ্খলা ব্যতিরেকে কোন প্রতিষ্ঠানই এর উদ্দেশ্য অর্জন বা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। হেনরী ফেয়লের মতে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হলে কতগুলো শর্ত মেনে চলতে হবে-

ক) ব্যবস্থাপনার প্রত্যেক স্তরে উপযুক্ত সুপারভাইজার নিযুক্ত করতে হবে।
খ) সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে মতৈক্য থাকতে হবে।
গ) ভাল কাজের জন্যে উপযুক্ত পুরস্কার ও অন্যায় কাজের জন্যে ন্যায়সংগত শাস্তির প্রয়োগ থাকতে হবে।

৪. আদেশের ঐক্য *(Unity of command)* : এ নীতির বক্তব্য হল একজন কর্মী একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য মাত্র একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছ থেকে আদেশ গ্রহণ করবেন। একজন অধঃস্তন কর্মীর কাছে একাধিক উর্ধ্বতনের কাছ থেকে আদেশ এলে কর্মী কোনটা রেখে কোনটা পালন করবে তা স্থির করতে পারে না। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোতে পূর্ব থেকেই এটা নির্ধারিত থাকা উচিত যে কোন কর্মী কার অধীনে কাজ করবে এবং কার কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। আদেশের ঐক্য থাকলে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের সঠিক ব্যবহার হয়, শৃঙ্খলা বজায় থাকে। ফলে বিশৃঙ্খলা ও দ্বন্দ্ব পরিহার করে প্রতিষ্ঠানের স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করা যায়।

৫.নির্দেশের ঐক্য *(Unity of Instruction)* : প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ব্যবস্থাপকীয় স্তর, বিভিন্ন বিভাগ, উপ-বিভাগের কাজ এক কেন্দ্রিক হওয়া সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রথম শর্ত। এ শর্ত অর্জনের জন্যে প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণ সমগ্র প্রতিষ্ঠান ও প্রত্যেকটি বিভাগের মধ্যে নির্দেশদানের সামঞ্জস্যবিধাণ করতে হবে। নির্দেশদানের সামঞ্জস্য বিধান তখনই সম্ভব যখন একজন কর্মীর ওপর এক সময়ে একাধিক কাজের দায়িত্ব অর্পিত হবে না।

৬.সাধারণ স্বার্থের উর্দ্ধে ব্যক্তিগত স্বার্থ *(Subordiantionof individual interest on general interest)* :প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক স্বার্থকে সকল সময়েই ব্যক্তিস্বার্থ থেকে উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। মানুষের স্বাভাজাত চরিত্র যে সে তার নিজস্ব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দিতে চায়। এটা ততক্ষণ পর্যন্ত মেনে নেয়া যায় যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের বা দলীয় স্বার্থের সাথে সংঘাতপূর্ণ না হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব হল ব্যক্তিস্বার্থের সাথে সার্বজনীন স্বার্থের সমন্বয় করা।

৭.পারিশ্রমিক *(Remuneration)*: প্রতিষ্ঠানে কর্মীরা শ্রম ও দক্ষতা নিয়োগ করে। এর বিনিময়ে তারা যা প্রত্যাশা করে তাকে পারিশ্রমিক বলে। পারিশ্রমিক এমন হওয়া উচিত যাতে মালিক ও কর্মী উভয়ই সন্তুষ্ট হতে পারে। কর্মীদেরকে উপযুক্ত ও ন্যায়সংগত পারিশ্রমিক দিতে হবে। এতে তাদের মনোবল বাড়বে এবং তারা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আন্তরিক হবে। কর্মী পারিশ্রমিক নির্ধারনের ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যয়, কর্মীদের যোগ্যতা, কর্মী প্রাপ্যতা, ইত্যাদি আন্ত-উপকরণ এবং শ্রমআইন, সরকারি হস্তক্ষেপ, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি বহি:উপকণ প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

৮. কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ*(Centralization)*:যা কিছু অধঃস্তন কর্মীদের ভূমিকা সংকুচিত করে, তাই কর্তৃত্বের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যদিকে যা কিছু অধঃস্তন কর্মীদের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করে, সেটাই কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ।

সংগঠনের উচু পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কেন্দ্রীভুত থাকে। সাধারনতঃ ছোট প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কেন্দ্রে কেন্দ্রীভুত থাকে আর বড় প্রতিষ্ঠানের এ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রীকরণ হয়ে থাকে। কর্তৃত্বের অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরন নিম্ন পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের কাজ সম্পাদনে নিরুৎসাহীত করে তোলে। তাদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্যে সামঞ্জস্যপুর্ণ বিকেন্দ্রীকরণ অত্যাবশ্যক। অবশ্য প্রতিষ্ঠানের আয়তন যাই হোক না কেন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্যে কিছু ক্ষমতা কেন্দ্রের থাকতেই হয়।

৯. স্তরানুক্রমিক কর্তৃত্বের শিকল *(Scalar Chain)* : ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব*(Line of authority)* উঁচু স্তর থেকে ধাপে ধাপে শিকলের ন্যায় নিচের দিকে নেমে আসে। এ নীতিতে বলা হয়েছে উঁচু স্তরের কর্তৃপক্ষ ঠিক তার পরবর্তী নিচের স্তরের কর্তৃপক্ষের ওপর আদেশ জারি করবেন আবার নিচের স্তরের কর্মী ধাপে ধাপে স্তর অতিক্রম করে উঁচু স্তরের কর্তৃপক্ষের কাছে তার মতামত, সুপারিশ, অভিযোগ প্রতিবেদন পেশ করবেন।

সমস্তরের *(same ranks)*কর্মীরা সরাসরি নিজেদের মধ্যে মতবিনিময় ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন। এ যোগাযোগ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি নিয়ে করা যেতে পারে কিংবা জরুরী অবস্থায় সমস্তরের কর্মীরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের পরে উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপককে অবহিত করতে পারেন।

১০. বিন্যাস (*order*) : বস্তু বা ব্যক্তির ব্যবস্থাপনায় ক্ষেত্রে বিন্যাস হল সংগঠনের একটি মুল সূত্র। সংগঠনে দু'ধরনের বিন্যাস প্রয়োজন-১. বস্তুগত বিন্যাস (*material order*) ২. সামাজিক বিন্যাস (*social order*)।এর মূল কথা হল-বস্তুগত বিন্যাসের ক্ষেত্রে, প্রতিটি বস্তুর জন্যে নির্দিষ্ট স্থান থাকবে এবং বাস্তবতার স্থানে থাকবে (*a place for everything and everything in its place*) ও সামাজিক শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে একটি উপযুক্ত স্থান থাকবে এবং প্রত্যেকেই তার স্থানে থাকবে (*right place for everyone and everyone in his place*)।এ নীতি বাস্তবায়নে বস্তুর ক্ষেত্রে অপচয় এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রে শ্রমের অপব্যবহার রোধ করে প্রতিষ্ঠানে নিরবিচ্ছিন্ন কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব হয়।

১১. সমদর্শিতা (*Equity*) : হেনরী ফেয়ল ন্যায় বিচারের পরিবর্তে সমদর্শিতা শব্দ ব্যবহার করেছেন। ন্যায়বিচার (*justice*) প্রতিষ্ঠিত হয় প্রচলিত নিয়মানুসারে। সমদর্শিতা হচেছ ন্যায় বিচার ও দয়ার সমষ্টি (*combination of kindness and justice*)। কর্মীরা যাতে করে আন্তরিকতা ও আনুগত্যের সাথে কাজ করে তার জন্যে তাদের সাথে সমদর্শিতার আচরণ করতে হবে। ব্যবস্থাপনার সকল স্তরানুক্রমিক কর্তৃত্বের শিকলে সমদর্শিতা স্থাপন করতে হবে। প্রতিষ্ঠানে এ নীতি কার্যকর হলে উধ্বর্তনের প্রতি নিচুস্তরের কর্মীদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যসম্পাদনের দলীয় মনোভাব গড়ে উঠে।

১২. কর্মীদের কার্যকালের স্থায়িত্ব (*Stability of tanure of personnel*) : প্রতিষ্ঠানের নতুন কর্মীর পক্ষে কাজ বুঝে উঠতে অথবা তার কর্মদক্ষতা প্রমাণ করতে সময় দরকার। কর্মীকে যদি সঠিকভাবে কাজ বুঝে উঠার আগেই বরখাস্ত বা বদলি করা হয় তবে দক্ষতার সাথে কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এই জন্যেই কর্মীদের চাকরির স্থায়িত্ব বিধান আবশ্যক। কর্মীদের কার্যকালের স্থায়িত্ব বিধান করা হলে প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের চাকুরীর ছাড়ার হার কমে, কর্মী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ ব্যয় হ্রাস পায় ও কর্মীদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি হয়।

১৩. উদ্যম (*Initiative*) : কর্মীকে তার নিজস্ব পরিসরে কাজে উদ্যোগ নেয়ার এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সুযোগ দেয়া উচিত। ফেয়লের মতে প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরেই এ নীতি কার্যকর থাকা দরকার। উদ্যম কর্মীদেরকে কাজে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টিকরে। প্রতিষ্ঠানে গতিশীল নেতৃত্ব (*dynamic leadership*) চালূ থাকলে তার পরিসরে নতুন কাজের পরিকল্পনা প্রস্তুত করার এবং বাস্তবায়নের স্বাধীনতা ভোগ করে।

১৪. দলীয় একতা (*Esprit de corps*) : *Esprit de corps* শব্দগুচ্ছটি ফরাসী। এর অর্থ গোষ্ঠী চেতনা (*team spirit*)। প্রতিষ্ঠানের জনশক্তির ঐকবদ্ধ গোষ্ঠী চেতনা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে। ব্যবস্থাপনার কাজ হল নিজ দলের প্রতি কর্মীদের গভীর আনুগত্যের মনোভাব তৈরি করা। এ নীতি প্রতিষ্ঠানে কার্যকর করতে গতিশীল নেতৃত্ব ও আন্তঃব্যক্তিক ও আন্তবিভাগীয় অনানুষ্ঠানিক যোগযোগ চালু করা অত্যন্ত জরুরী।

ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী*(Functions of Mangement)*

প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত উপকরণাদির এবংমানব সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের প্রচেষ্টা বা কৌশলই হলো ব্যবস্থাপনা। ব্যবস্থাপনার এরূপ প্রচেষ্টা কতকগুলো ধারাবাহিক ও পরস্পর নির্ভরশীল কাজের সমষ্টি।

ব্যবস্থাপনার প্রধান কার্যাবলী নিম্নের রেখাচিত্রে তুলে ধরা হলো ঃ

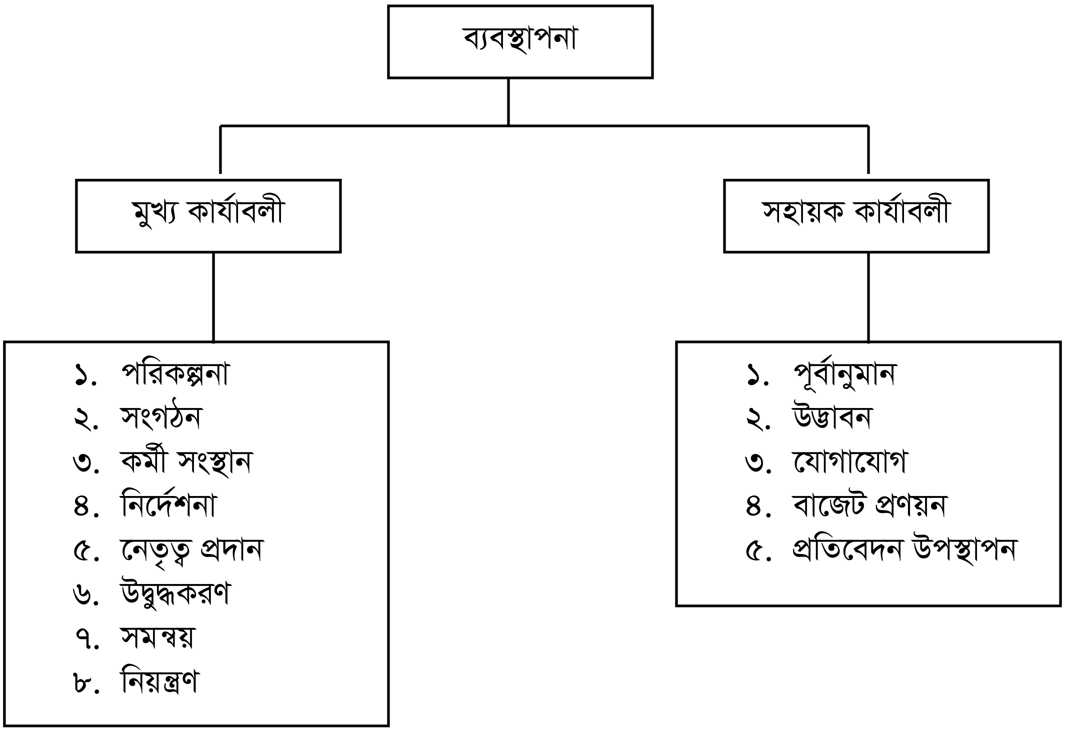

১. **পরিকল্পনা (*Planing*)** : পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার প্রথম ও সবচেয়ে মৌলিক কাজ। ভবিষ্যতে কি করতে হবে তার অগ্রিম সিদ্ধান্তকে পরিকল্পনা বলে। প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনে কি করতে হবে, কিভাবে করতে হবে, কার দ্বারা করতে হবে, কখন ও কত সময়ে করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণকেই পরিকল্পনা বলা হয়। পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজের ভিত্তিস্বরূপ।

২. **সংগঠন (*Organization*)** : পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য বা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ হলো প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত জনশক্তি ও অন্যান্য উপায়-উপাদানকে সংগঠিত করে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা । এরূপ সংগঠিতকরণ ও কার্যোপযোগীকরণকে সংগঠন বলে।

সংগঠন হচ্ছে একটা প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে কাজের প্রকৃতি অনুসারে কর্মীদের যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের ওপর দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করেন, কর্মরত কর্মী ও তাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে কর্তৃত্ব, দায়িত্ব ও সম্পর্কের কাঠামো নির্ধারণ করেন এবং কাজ সম্পাদনের জন্যে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহ ও সুসংহত করেন।

প্রতিষ্ঠানের সকল কাজ সম্পাদনের জন্যে ব্যবস্থাপক তার অধীনস্থদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেন। তিনি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করেন যাতে কর্মীরা উৎসাহ নিয়ে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সূচারুরূপে পালন করতে পারে।

৩. **কর্মীসংস্থান (*Staffing*)** :প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী জোগাড় করার কাজকেই সাধারণ অর্থে কর্মীসংস্থান বলে। তবে ব্যাপক অর্থে, বিভিন্ন বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী নির্বাচন, মানোন্নয়ন ও সংরক্ষণ করার কাজকে কর্মীসংস্থান বলা হয়ে থাকে।

ব্যবস্থাপক যেমন সংগঠন তৈরি করেন তেমনি সংগঠন কাঠামোর জন্যে উপর্যুক্ত কর্মীনির্বাচন, তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মীদের জন্যে কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরিও তার কাজ। কর্মীসংস্থান হল এমন পদ্ধতি যার মাধ্যমে ব্যবস্থাপক তার অধঃস্তন কর্মীদের নির্বাচন করেন, প্রশিক্ষণ দেন, পদোন্নতি করেন এবং পরিশেষে অবসর গ্রহন করান।

৪. **নির্দেশনা (*Direction*)** :নির্দেশনা বলতে সংগঠন কাঠামোতে নিযুক্ত কর্মীদের কাজ শুরু করার জন্য ব্যবস্থাপক কর্তৃক আদেশ উপদেশ প্রদান করাকে বুঝায়। নির্দেশনা একটি জটিল মানবিক প্রক্রিয়া। এতে কর্মীদের কর্মপ্রবণতা ও আচরণবিধি অনুধাবন করার প্রয়োজন হয়।

নির্দেশনা হচ্ছে-১.কর্তব্য নির্দিষ্ট করা; ২. আদেশ ও নির্দেশ দেয়া; ৩. গতিশীল নেতৃত্ব প্রদান করা। নির্দেশনার ফলে কর্মীরা দিকনির্দেশনা পায়, দ্বিধা, সংকোচ ও ভয়ভীতি কাটিয়ে উঠতে পারে এবং কাজের গতি অব্যাহত রাখার মাধ্যমে কর্মদক্ষতার পরিচয় দিতে পারে।

৫. **নেতৃত্বদান (*Leading*):**নেতৃত্ব হল এমন একটি শক্তিশালি উপাদান বা কৌশল যা অধঃস্তন বিভিন্ন লোকের প্রকৃতি ও স্বরূপকে সামনে রেখে তাদের এমনভাবে পরিচালিত করে যাতে সবাই আস্থার সাথে স্বতঃস্ফুর্তভাবে দলীয় ও সাংগঠনিক উদ্দেশ্য অর্জনে তৎপর হয়। বস্তুতঃ কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে কোন ব্যক্তি বা দলের আচরণ, মনোভাব, প্রচেষ্টা ও সামগ্রিক কর্মকান্ডের ওপর প্রভাব বিস্তারের প্রক্রিয়াকেই নেতৃত্ব বলে। নেতৃত্ব হচ্ছে একটি প্রভাবিতকরণ কার্যক্রম, যার মাধ্যমে একজন জ্যেষ্ঠকর্মী কনিষ্টকে এবং একজন নির্বাহী তার অধঃস্তন কর্মীকে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পরিচালিত করে থাকেন। সাধারণত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে কোন ব্যক্তি বা দলের আচরণ, মনোভাব, কার্যাবলী ও প্রচেষ্টার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী প্রক্রিয়াই হচ্ছে নেতৃত্ব। এতে কর্মীরা অনুপ্রাণিত হয়, তাদের মধ্যে দলীয় কর্মদক্ষতা বাড়ে এবং দলীয় কার্যসম্পাদনের গতি বেড়ে যায়।

৬. **উদ্বুদ্ধকরণ(*Motivation*):** কর্মীদের মধ্যে কার্যসম্পাদনের প্রেরণা সৃষ্টিকে উদ্বুদ্ধকরণ বলে। উদ্বুদ্ধকরণ হল একটি অন্তর্নিহিত মনস্তাত্বিক প্রক্রিয়া (*inner psychological process*)। কর্মী যন্ত্র নয়। কর্মীকে দিয়ে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করানো যায় না। তার কাছ থেকে কাজ আদায় করতে হলে তার ইচ্ছা, আকাংঙ্খা, অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে হয়। ব্যবস্থাপক তার কর্মীদের পুরস্কার, তিরস্কার, স্বীকৃতি, উন্নত কাজের শর্ত ও পরিবেশের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করেন।

৭. **সমন্বয় (*Coordination*):** প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপকের অন্যতম কাজ হল সমন্বয়করণ। সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ, উপ-বিভাগ ও কর্মীদের কাজকে একসূত্রে গাঁথা যায়। সমন্বয় প্রতিষ্ঠানের কাজের ধারাকে গতিশীল রাখে এবং কর্মীদের মিলিত কর্মশক্তি প্রয়োগের প্রভাবে (*Synergic effect*)প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। সমন্বয় প্রতিষ্ঠানে সহযোগীতামূলক কার্যকারিতা (*Collaborative effectiveness*)আনয়ন করে।

৮. **নিয়ন্ত্রন (*Controlling*) :** নিয়ন্ত্রন একটি ফলাবর্তন (*feedback*)ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য যথাযথভাবে অর্জনের জন্যে পূর্বে নির্ধারিত আদর্শমানের ভিত্তিতে অর্জিত ফলাফলের তুলনা করে নিরূপিত বিচ্যুতি দূরীকরণকল্পে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ সুশীল মুখার্জীর মতে নিয়ন্ত্রণ অর্থ কর্মীকে ধাওয়া করা নয়,কর্মীকে অনুসরণ ও সংশোধন করা। ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের সাথে কর্মীদের কাজ সংগতিপূর্ণকরেন।

ব্যবস্থাপক ৫টি ধাপের মাধ্যমে এই নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া সম্পাদন করেন। ধাপগুলো হল-

১. কাজের আদর্শমান প্রতিষ্ঠা
২. সম্পাদিত কাজের পরিমাণ
৩. প্রতিষ্ঠিত আদর্শমানের সাথে সম্পাদিত কাজের তুলনা
৪. বিচ্যুতিকরণ নির্ধারণ
৫. সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

ওপরে বর্ণিত কাজগুলো একটি অন্যটির পরিপূরক। একটির সফল সম্পাদন অন্যটির সম্পাদনের জন্য অপরিহার্য এবং এগুলোর সুষ্ঠু সম্পাদনের মাধ্যমেই ব্যবস্থাপক তাঁর প্রতিষ্ঠানের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারেন। এ অপরিহার্য কাজগুলো ছাড়াও ব্যবস্থাপককে আরো নিচে বর্ণিত কাজগুলো সম্পাদন করতে হয়।

১. **নতুন বিষয় উদ্ভাবন (*Innovation*):** পিটার ড্রাকার বলেন "ব্যবস্থাপনা" প্রয়োগমূলক কাজের চাইতেও একটি সৃজণশীল কাজ। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে ব্যবস্থাপককে নতুন নতুন কৌশল, পন্থা বা কার্যধারা প্রবর্তন করতে হয়।

২. **যোগাযোগ (*Communication*) :**সুষ্ঠু যোগাযোগ প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপকের সকল কাজকে গতিশীল রাখে। যোগাযোগের মাধ্যমেই ব্যবস্থাপক কর্মীদেরকে প্রতিষ্ঠানের নীতির ব্যাখ্যা, প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য বর্ণনা, প্রয়োজনীয় নির্দেশদান করতে পারেন এবং এ সংক্রান্ত ব্যাপারে কর্মীদের মতামত নিতে পারেন। যোগযোগের মাধ্যমে ফলাবর্তন (*feedback*) পাওয়া সম্ভব।

৩. **বাজেট প্রণয়ন(*Budgeting*):** পরিকল্পনার সংখ্যাত্মক প্রকাশকে বাজেট বলে। নির্দিষ্ট সময়ে একটা প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য আয়-ব্যয় বা প্রাপ্তি প্রদানের আর্থিক পরিকল্পনাকে বাজেট বলা হয়। সাধারণভাবে বাজেট তৈরী পরিকল্পনারই একটা অংশ। তবে পরিকল্পনার ব্যাপ্তি অনেক বেশি হওয়ায় বাজেট প্রণয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের নিমিত্তে ব্যবস্থাপনা বিশারদই একে ভিন্ন কাজ হিসেবে দেখানোর প্রয়াস পেয়েছেন।

৪. **প্রতিবেদন উপস্থাপন(*Reporting*):** কোন বিষয়ে তথ্য তুলে ধরে যে বিবরণী উপস্থাপন করা হয় তাকে প্রতিবেদন বলে। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রতিবেদন গুরুত্বপূর্ণ। পরিকল্পনা, নির্দেশনা, সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজেও প্রতিবেদন গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। বিশেষ প্রয়োজনের উপরেও নির্দিষ্ট প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। লিখিত ও মৌখিকভাবে প্রতিবেদন উপস্থাপিত হতে পারে।

হ্যান্ডআউট ১.২ ঃ সহায়ক/কার্যকর তত্ত্বাবধান (Supportive/Effective Supervision)

তত্ত্বাবধানের সংজ্ঞা

সাধারণ অর্থে তত্ত্বাবধান বলতে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীদের কার্যাবলী সরাসরিভাবে পরিচালনা করা বা তদারক করাকে বুঝায়। অর্থাৎ উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপনা থেকে প্রাপ্ত দায়িত্বসমূহ কর্মীদের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে নেওয়ার প্রক্রিয়াকে তত্ত্বাবধান বলে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে একজন সুপারভাইজারকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। কারো কারো মতে, সুপারভাইজার হলো সংগঠনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তি, মধ্যম ব্যক্তি, প্রান্তিক ব্যক্তি বা একজন অতিরিক্ত কর্মী। আবার কারো কারো মতে, সুপারভাইজার একজন আচরণ বিশেষজ্ঞ, যিনি কর্মীদের অভাব অভিযোগ অনুধাবণপূর্বক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে কার্যে উদ্বুদ্ধ(Motivate) করেন।

তত্ত্বাবধানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা(*Need and Importance of Supervision*)

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের জন্যই তত্ত্বাবধান একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুষ্ঠু ও সুশৃংখল এবং কার্যকর তত্ত্বাবধানের অভাবে প্রতিষ্ঠানের কার্য ব্যাহত হয়। একজন সুপারভাইজার যদিও উভয় সংকটপূর্ণ অবস্থায় অবস্থান করেন তবুও উদ্দেশ্য অর্জনে তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে তত্ত্বাবধানের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো ঃ

১. **লক্ষ্য অর্জন (*Attainment of Goals*) ঃ** প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন একান্ত আবশ্যক। পরিকল্পনা বা নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দক্ষতার সাথে সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করতে পারলে লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়।

২. **সুষ্ঠু নির্দেশমালা (*Proper Direction*) ঃ** কোন প্রতিষ্ঠানে নির্দেশনা না দিলে কার্য সম্পাদন সম্ভব নয়। নির্দেশ দান এর সঙ্গে সঙ্গে কর্মীদের হাতে-কলমে দেখিয়ে দেয়া প্রয়োজন হয়। এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সুপারভাইজার করে থাকে।

৩. **কার্যকর সমন্বয় (*Effective Coordination*) ঃ** উচুঁস্তরেরর ব্যবস্থাপনার সাথে কর্মীদের সরাসরি যোগাযোগ বা সম্পর্ক থাকে না। তাই উচুঁস্তর ব্যবস্থাপনা কর্তৃক প্রণীত পরিকল্পনা ও নীতিমালা কর্মীদের কাছে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়ে। আবার তাদের অভাব অভিযোগ উচুঁস্তরের ব্যবস্থাপনার কাছে অবগত করার জন্য উভয় দলের মাঝখানে সুপারভাইজার পারস্পরিক যোগাযোগ রেখে সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করে।

৪. **পরামর্শ দান (*Counselling*) ঃ**সুপারভাইজার কর্মীদের আচরণ সম্পর্কে ভালভাবে অবগত থাকেন। তাই তাদের মন মানসিকতা উপরস্থ কর্মকর্তাদের কাছে জানানো সম্ভব। আবার কর্মীদের কিভাবে কার্য সম্পাদন করতে হবে সে সম্পর্কে উপদেশ দেয়া সুপারভাইজারদের পক্ষেই সম্ভব।

৫. **দক্ষতা উন্নয়ন (*Development of Skills*) ঃ** সুপারভাইজারগণ কর্মীদের কাজে সরাসরি সহায়তা করে বিধায় তাদের দক্ষতার উন্নতি হয়। কর্মচারী, কর্মকর্তা ও সুপারভাইজার সকলেই উপকৃত হয় এবং প্রতিষ্ঠানে কার্য সন্তুষ্টি বিরাজ করে।

ব্যবস্থাপনার জটিল কার্যাবলী একককভাবে কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। উচুঁস্তরের ব্যবস্থাপকদের পক্ষে প্রতিটি ইউনিটের যাবতীয় কার্যাবলী দেখাশুনা করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় তাদের বিশ্বস্ত সুপারভাইজারের উপর নির্ভর করতে হয়। সুপারভাইজারগণের দক্ষতা ও বিশ্বস্ততা যত আস্থাশীল হয় ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী তত ফলপ্রসূ হয়।

কার্যকর তত্ত্বাবধানের উপাদান (*Factors of Effective Supervision*)

সুপারভাইজারের কাজকে দক্ষতা ও সফলতার সাথে সম্পাদন করার জন্য ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করা দরকার। কর্মচারীদের সমস্যাগুলোকে বিচার বিবেচনা করা দেখা আবশ্যক। কর্মচারীদের কর্মস্পৃহা যাতে ভাল হয় সেজন্য তাদের পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করা উচিত। এভাবে সুপারভাইজারগণ তাদের দায়িত্ব ফলপ্রসূভাবে সম্পাদন করতে পারেন। সুপারভাইজারদের কাজগুলোকে ফলপ্রসূ করার জন্য কতগুলো উপাদান বিবেচনা করা যেতে পারে। নিম্নে এই উপাদানগুলোর বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

১. **গুণগত মানের উপর তত্ত্বাবধানের কার্যকারিতা ফলপ্রসু হয়(*Supervisory Effectiveness in Relation to Supervision Received*) ঃ** সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, সুপারভাইজারগণ নিজেরা যেভাবে তদারকি হন সেভাবেই তারা অন্যদের তদারক করার প্রবণতা দেখায়। প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তি যদি সুপারভাইজারের প্রতি সহানুভূতিশীল হন এবং তাকে সমর্থন করেন বা তার কাজের প্রতি সমর্থন দান করেন তাহলে সুপারভাইজারগণও একইরূপ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।

২. **কার্যকর যোগাযোগ প্রয়োজন (*Need for Effective Communication*) ঃ** একজন সুপারভাইজারকে প্রতিদিন বিভিন্ন ধরণের লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। যেসব লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয় সেসব লোকেরা চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্খা ও আচরণ বিভিন্ন রকম। কাজেই একজন সুপারভাইজার বহুমুখী যোগাযোগ আচরণের জন্য বিভিন্নমুখী জ্ঞানসম্পন্ন অন্যান্য স্টাফ এবং সেবা-কর্মীদের সাথে যোগাযোগের জন্য অধিক সময় ব্যয় করে।

৩. **নিবিড় বনাম সাধারণ তত্ত্বাবধান (*Close Supervision and General Supervision*) ঃ** যখন সুপারভাইজাররা কোন একটি কাজ অত্যন্ত ত্রুটিমুক্তভাবে করার প্রতি দৃষ্টি দেয় তখন নিবিড় তত্ত্বাবধানের উদ্ভব হয়। অন্যদিকে সাধারণ তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে সুপারভাইজারগণ ব্যাপক আকারের কার্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং কর্মীদের কার্য সম্পাদনের জন্য কিছু স্বাধীনতা দেয়া হয় যাতে তারা স্বেচ্ছায় কার্য সম্পাদন করতে পারে। ফলশ্রুতিতে কর্মীরা নিজস্ব বিচার বুদ্ধি কাজে লাগাতে সক্ষম হয়। নিবিড় তত্ত্বাবধানে কাজের স্বাধীনতা কম থাকে এবং এতে কর্মীরা মনে করে যে তাদের কাজ করার ব্যাপারে কোন নিজস্ব বিচার বিবেচনার ক্ষমতা নাই। বারবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করার ফলে এবং বেশী নিয়ম কানুন থাকার কারণে কর্মীরা এ নিয়মের শিকার হয়ে পড়ে। ফলে কাজটি ঠিকমত করা কর্মীর পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না অর্থাৎ সব সময় নিবিড় তত্ত্বাবধানের ফলে কার্যতুষ্টি ও উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়। কারণ কতকগুলো কাজ আছে যেখানে নিবিড় তত্ত্বাবধান দরকার পড়ে। যেমন- কারিগরি কাজের (*Technical Work*) ক্ষেত্রে অবশ্যই নিবিড় তত্ত্বাবধান আবশ্যক। পক্ষান্তরে কাজের একটা ব্যাপক পরিকল্পনা (*Broad Assignment*) দেয়া হলে এর মধ্যে কোন কর্মচারী কোন কাজ করবে তা ঠিক করে দেয়া হলে, সেই মোতাবেক কর্মী নিজের স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করলে তাকে সাধারণ তত্ত্বাবধান বলা হয়।

৪. **রাজনীতি ও ক্ষমতা (*Politics and Power*)** ঃপ্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই রাজনীতি ও ক্ষমতা বর্তমান থাকে। প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার দ্বন্দ্ব দূর করে একটি সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। রাজনীতির মাধ্যমে সুপারভাইজারের ক্ষমতাকে একটি ভারসাম্যমূলক অবস্থায় এনে থাকে। রাজনীতির দ্বারা সুপারভাইজারগণ প্রতিষ্ঠানে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। একইভাবে ক্ষমতা না থাকলে সুপারভাইজারদের কথা কেউই শুনবে না। তাই রাজনীতি ও ক্ষমতা, কার্যকর সুপারভাইজারের নির্ধারনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৫. **সমর্থিত ভূমিকা আচরণ (*Supportive Role Behaviour*)** ঃ একজন কর্মী দ্বারা কাজ করাতে হলে তাকে অবশ্যই মানুষ হিসাবে গণ্য করতে হবে। তাই সুপারভাইজারকে অবশ্যই মানবীয় সম্পর্ক বিষয়টি বিবেচনা করতে হয়। কর্মচারীর অভাব অভিযোগ অনুধাবন করতে ব্যর্থ হলে তাদের আস্থা ও বিশ্বাস হারানোর সম্ভাবনা থাকে। অতএব মানবীয় বিষয়টি সুপারভাইজারকে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে।

৬. **ক্লিনিক্যাল পদ্ধতি (*Clinical Method*)** ঃ পরিস্থিতি বুঝার জন্য সুপারভাইজারকে এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। একজন চিকিৎসক যেমন রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগীর দেহ পরীক্ষা করেন, তেমনি সুপারভাইজারকেও সামাজিক ব্যবস্থা বিবেচনা করতে হয় যেখানে কর্মীরা অবস্থান করে। কাজের একটা অংশ আর একটার সঙ্গে কিভাবে সংশ্লিষ্ট তা দেখে শুনে এবং পর্যবেক্ষণ করে, এই পদ্ধতিতে পরিস্থিতির প্রকৃত অবস্থা বুঝার চেষ্টা করা হয়। এছাড়া মানুষের আবেগ ও এর প্রভাবও এক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়।

কার্যকর সুপারভাইজারের জন্য নৈতিক মূল্যবোধ (*Ethical Values for Effective Supervisor*)

একজন সুপারভাইজারকে কর্মীদের দ্বারা কাজ করাতে হলে মানবিক সম্পর্কের পাশাপাশি আরো কতকগুলো নৈতিক মূল্যবোধও বিবেচনা করতে হয়। যার মধ্যে নৈতিকতা নেই সে কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে না। অন্যের সাথে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টি করার জন্য এবং অধঃস্তনদের ভালবাসা ও সমর্থন আদায় করার জন্য সুপারভাইজারকে নৈতিক মূল্যবোধগুলো বিবেচনা করতে হয়। সুতরাং সুপারভাইজারকে এই নীতিগত বিষয়টির প্রতি অত্যধিক যত্নসহকারে গুরুত্বারোপ করতে হয়। *Robert D. Gray*সুপারভাইজারের কার্যকারিতার জন্য কতকগুলো নৈতিক নিয়মাবলীর (*Code of Ethics*) কথা বলেছেন। সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. সুপারভাইজার কর্মীদের কাছ থেকে যেরকম আচরণ আশা করেন সেরকম আচরণ নিজে করে তিনি উদাহরণ সৃষ্টি করবেন।

২. সুপারভাইজার সর্বদা ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন এবং ভবিষ্যতের উপর তুলনামূলকভাবে বেশী গুরুত্ব আরোপ করবেন। কারণ সুপারভাইজারের যোগ্যতার মূল্যায়ন ঘটবে ভবিষ্যতের সাফল্য দিয়ে।

৩. সুপারভাইজার যদি কোন কারণে ভুল করেন, তাহলে সৎ সাহসে তা স্বীকার করবেন। কারণ মানুষের ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

৪. যে কোন সমস্যার মূল কারণ উদঘাটন করা হলো সুপারভাইজারের কাজ। লক্ষণ বা চিহ্নের উপর নির্ভর করা সমীচীন নয়। সমস্যার মূল কারণ অনুধাবন করে মূলোৎপাটনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা তার দায়িত্ব। অন্যথায় সমস্যার পুণরাবৃত্তি ঘটতে পারে।

৫. ফলাফলকে দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী এই উভয় দৃষ্টিকোণে বিবেচনা করতে হবে। শুধুমাত্র একটি দৃষ্টিকোণ থেকে (যেমন স্বল্পমেয়াদী অথবা দীর্ঘমেয়াদী) বিবেচনা করা সমীচীন নহে।

৬. যে সব কর্মী কার্যে নিয়োজিত আছে তাদের সকলের সুবিধা অসুবিধার দিকে সুপারভাইজারের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

৭. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং নৈতিকতাবোধ সৃষ্টি করার জন্য আইন ও নৈতিক মূল্যবোধসমূহ ব্যবহার করতে হবে। এ ব্যাপারে সততাও প্রতিষ্ঠিত আইনকে স্বীকৃতি দেয়া আবশ্যক। ফলে কর্মীগণ সৎ হওয়ার প্রবণতা দেখায় এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়।

৮. প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটা সামাজিক মূল্যবোধ আছে। সুতরাং প্রত্যেক কর্মচারীর মূল্যবোধের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা সুপারভাইজারের দায়িত্ব।

৯. সুপারভাইজার কর্মীদের আচরণ ও মানসিকতা পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে পারলে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সম্ভব হয় এবং তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত ও কৌশল নির্ধারণ করা সহজসাধ্য হয়। আর এজন্য সুপারভাইজারকে কর্মচারীদের কাছে আসতে হয় এবং তাদেরকে পরিবারের সদস্যদের মত আপন করে নিতে হয়। এমনিভাবেই গড়ে উঠে কর্মচারী-সুপারভাইজার সুসম্পর্ক।

একজন সার্থক সুপারভাইজারকে কর্মীদের সর্বশক্তি নিয়োগপূর্বক কার্যে আত্মনিয়োগ করতে হলে উপরেল্লিখিত নৈতিক মূল্যবোধগুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হবে।

হ্যান্ডআউট ১.৩ ঃ ব্যবস্থাপকের এবং সুপারভাইজারেরদক্ষতা ও ভূমিকা

(Skills & Role of a Manager and Supervisior)

ব্যবস্থাপক (*Manager*)

প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে ব্যবস্থাপকের কাজের ওপর। প্রতিষ্ঠানের কাঠামো যত জটিল ব্যবস্থাপকের ভূমিকা তত বেশী। ব্যবস্থাপকের কাজ হচ্ছে মানবীয় ও বস্তুগত সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জন। যন্ত্রপাতি, মূলধন, সুযোগ-সুবিধা, তথ্য ইত্যাদি বস্তুগত সম্পদ কেবলমাত্র মানুষের মাধ্যমে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। মানবম্পদই প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। সুতরাং একজন ব্যবস্থাপককে মানব সম্পদের কাম্য ব্যবহার কৌশলের উপর দক্ষ হতে হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ব্যবস্থাপককে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। ব্যবস্থাপনাবিদ *R. Kayne* বলেন "একজন অথবা অধিক কর্মী বা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগগুলোর ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য যিনি ব্যাপৃত থাকেন তিনি ব্যবস্থাপক(*"A manager is a person tasked with overseeing one or more employees or departments carry out assigned duties as required"*)। প্রতিষ্ঠানের আয়তনের ওপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের একক, দ্বৈত বা ত্রি-স্তরীয় ব্যবস্থাপনা থাকতে পারে।

ব্যবস্থাপককে তার টীমের শক্তি এবং দুর্বলতা সম্পর্কে জানতে হবে, তাকে টীমের লক্ষ্যের নকশা আঁকতে হবে, এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে টীমের প্রত্যেক সদস্যের কাজ বিভাজন করতে হবে, টীমের সদস্যের কাজ সম্পাদনের জন্যে তাদেরকে প্রয়োজনীয় উপকরণ দিতে হবে এবং তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

একজন ব্যবস্থাপক অন্যদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেন। এটা সম্ভব-

- তাদেরকে (অধঃস্তনদেরকে) উদ্বুদ্ধ করে;
- নির্দেশনার প্রদানের মাধ্যমে;
- এটা নিশ্চিত করে যে তারা সকলে সাধারণ উদ্দেশ্য *(Common goal)* অর্জনের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে;
- ফলাবর্তন *(Feedback)*প্রদানের মাধ্যমে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ব্যবস্থাপক হচ্ছেন তিনি যিনি তার টীমের কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন, তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন; নির্দেশনা দান, উপকরণ সরবরাহ, কাজের সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনে চেষ্টা করেন।

ব্যবস্থাপকের দক্ষতা(*Skills of a Manager)*

১. **কারিগরি দক্ষতা** ***(Technical skills)*** : কারিগরি দক্ষতা বলতে ব্যক্তির যে কোন ধরণের প্রক্রিয়া বা কৌশল সম্পর্কিত জ্ঞান বা যোগ্যতাকে বুঝায়। উদাহরণ স্বরূপ, হিসাব বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীর কথা বলা যায়। এসব পেশাদার ব্যক্তিদের অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও যোগ্যতাকে কারিগরি দক্ষতা বলা হয়। এ দক্ষতাগুলি চাকুরির শুরুতে খুবই গুরুত্বপুর্ণ।

ব্যবস্থাপনার নিম্ন অর্থাৎ কর্মপ্রক্রিয়া পর্যায়ে এ ধরনের জ্ঞান ও দক্ষতা অত্যাবশকীয়। কিন্তু এই কর্মীরা যদি নেতৃত্বে আসে তা হলে এ ধরনের দক্ষতা খুবই কম গুরুত্বপুর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। কোন কর্মী পদোন্নতি পেয়ে ওপরের পদে প্রতিষ্ঠিত হলে এই ধরনের দক্ষতার গুরুত্ব ক্রমশ কমতে থাকে এবং অন্য দক্ষতাগুলোর প্রয়োজন বেড়ে যায়।

২.মানবীয় দক্ষতা*(Human skills)* : এ ধরনের দক্ষতা বলতে লোকের সাথে কার্যকরভাবে কাজ করার দলীয় কার্যসম্পাদন যোগ্যতাকে বুঝায়। একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা কর্মচারী ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক যৌথভাবে উদ্দেশ্য অর্জনে নিয়োজিত থাকে। উঁচু পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে নিচুস্তরের কর্মীদের মধ্যকার সম্পর্ক এবং এর ইতিবাচক ফলাফল সম্পর্কে অনুধাবন করার বিষয়টিকে মানবীয় সম্পর্ক দক্ষতা বলে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের জন্যে এ ধরনের যোগ্যতা খুব বেশি প্রয়োজন। এই ধরনের দক্ষতা ছাড়া কোন ব্যবস্থাপকের পক্ষে দক্ষতার সাথে কার্যনির্বাহ করা সম্ভব নয়।

৩. ধারণাগত দক্ষতা*(Conceptual skills)* : প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদানগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক স্থির করার ক্ষমতা ব্যবস্থাপকের থাকা দরকার। সংগঠনের দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে কৌশল বাস্তবায়নসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়াদিসম্পর্কিত ধারণা করার যোগ্যতাই ধারণাগত দক্ষতা। ব্যবস্থাপনাকে পদ্ধতিগত *(Systematic)*দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার ক্ষমতা থাকা ব্যবস্থাপকের জন্য অত্যন্ত জরুরী। যে সকল ব্যবস্থাপকের গভীর ধারণামূলক দক্ষতা থাকে তারাই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে পারেন।

৪. নমুনা দক্ষতা*(Design skills)* : এ দক্ষতার মূল কথা হল-প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকের সংগঠনের সমস্যা সনাক্তকরণ ছাড়াও সমস্যার বাস্তবভিত্তিক সমাধান বা পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে প্রকৌশলীদের মত নমুনা তৈরির দক্ষতা থাকতে হয়। প্রতিষ্ঠানের উঁচু এবং মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপকের এ ধরণের ক্ষমতার অধিক প্রয়োজন।

উপরের আলোচনায় উপসংহারে পৌঁছা যায় যে, ব্যবস্থাপনার নিচু স্তরের জন্যে সবচেয়ে বেশি দরকার কারিগরি দক্ষতা, তারপর মানবীয় সম্পর্ক দক্ষতা এবং ধারণাগত দক্ষতা এবং সবচেয়ে কম প্রয়োজন নমুনা দক্ষতার। মধ্যম স্তরীয় ব্যবস্থাপনার জন্যে দরকার প্রথমে মানবীয় সম্পর্কে দক্ষতার, এর পরে ধারণাগত দক্ষতার এবং উচু স্তরের ব্যবস্থাপনার জন্যে সবচেয়ে বেশি দরকার ধারণাগত ও নমুনা দক্ষতার, এর পরে মানবিক সম্পর্ক দক্ষতার এবং সবচেয়ে কম দরকার কারিগরি দক্ষতার।

এখানে একটি বিষয় লক্ষনীয় যে, মানবীয় দক্ষতা ব্যবস্থাপনার সকল স্তরেই সমভাবে গুরুত্বর্পুণ।

একজন ব্যবস্থাপকের ভূমিকা (*Role of a Manager*)

একজন ব্যবস্থাপক ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তিনি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সংগঠন, কর্মীসংস্থান, নির্দেশনা, উদ্বুদ্ধকরণ, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ কার্য পরিচালনা করেন। ব্যবস্থাপকের কাজ (ভূমিকা) হলো লক্ষ্য নির্ধারণ এবং প্রতিষ্ঠানের মালামাল, যন্ত্রপাতি, পদ্ধতি ও অর্থ কাজে লাগানো যাতে নির্দিষ্ট সময়ে শক্তি ও অর্থ ব্যয়ে তা অর্জন করা যায়। একজন ব্যবস্থাপককে প্রাত্যহিক যে সকল ভূমিকা পালন করতে হয় তা নির্ধারণের জন্য অনেকেই গবেষণাকর্ম পরিচালনা করেছেন। এর মধ্যে *The Mahoney Study* ও *The Mintzberz Study*উল্লেখযোগ্য। *The Mintzberz Study* তে বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের মোট কাজের মাত্রাকে ১০০ ধরে তাকে ৮ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ ঃ

১. পরিকল্পনাকারী (*Planner*) হিসেবে কাজ;
২. পরিদর্শক (*Investigator*) হিসেবে পরিদর্শনমূলক কাজ;
৩. সমন্বয়কারী (*Coordinator*) হিসেবে কাজ;
৪. ফলাফল মূল্যায়নকারী (*Evaluator*) হিসেবে কাজ;
৫. তত্ত্বাবধায়ক (*Supervisor*) হিসেবে তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত কাজ;
৬. মধ্যস্থতাকারী (*Negotiator*) হিসেবে আলাপ-আলোচনা বা দরকষাকষি সংক্রান্ত কাজ;
৭. বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ (*Multi-specialist*) হিসেবে কাজ; ও
৮. বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী (*Generalist*) হিসেবে সম্পাদিত কাজ।

মিনজবার্গ বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৫ জন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যাবলী যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করে এ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে নির্বাহীরা পরিচালনা, সংগঠন, আদেশদান, সমন্বয় এবং নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি গতানুগতিক ব্যবস্থাপকীয় কাজগুলোর পরিবর্তে তারা নিজেদেরকে বহুবিদ কাজে ব্যস্ত রাখেন। ব্যবস্থাপকরা বাস্তবিক পক্ষেই কী করেন এ বিষয়ে মিনজবার্গ তার নিজের এবং অন্যদের গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ব্যবস্থাপকরা প্রকৃতপক্ষে তিনটি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নিচে এগুলো দেয়া হল ঃ

ক) আন্তব্যক্তিক ভূমিকা*(Interpersonal roles)*

- প্রতিষ্ঠান প্রধানের ভূমিকা *(The figurehead role)*,প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও সামাজিক কর্তব্য পালন করা।
- নেতার ভূমিকা *(The leader role)*|
- যোগাযোগের ভূমিকা *(the liaison role)*,বিশেষ করে প্রতিষ্ঠানের বাইরের বিভিন্ন পক্ষের সাথে।

খ) তথ্যসংক্রান্ত ভূমিকা *(Information role)*

- তথ্যসংগ্রাহকের ভূমিকা *(The recipient role)*, প্রতিষ্ঠানের কার্যসম্পাদন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা।
- জ্ঞাতকারী বা প্রচারকের ভূমিকা *(The disseminator role)*,প্রতিষ্ঠানের কার্যসম্পাদন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা।
- মুখপাত্রের ভূমিকা *(The spokesperson role)*, প্রতিষ্ঠানের বাইরে পক্ষগুলোর মধ্যে তথ্য সরবরাহ।

গ) **সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত ভূমিকা*(Decision roles)***

- উদ্যোক্তার ভূমিকা *(The entrepreneurial role)*
- বিপত্তি মোকাবিলাকারীর ভূমিকা *(The disturbance-handler role)*
- সম্পদ বন্টনকারীর ভূমিকা *(The resource-allocator role)*
- মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা *(The negotiator role)*বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসনের কাজ করা।

১। আন্তঃব্যক্তিক ভূমিকা (*Interpersonal Roles*) ঃ ব্যবস্থাপকের আন্তঃব্যক্তিক ভূমিকা বলতে আনুষ্ঠানিক কর্তা, নেতা ও সংযোগকারী হিসেবে অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কর্তব্য ও কাজকে বুঝায়। প্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নেওয়ার স্বার্থে একজন ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক প্রধান হিসেবে ভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেন। এছাড়া নেতা হিসেবে অধনস্তদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, পরামর্শদান, তাদের পরিচালনা, উদ্বুদ্ধকরণ সংক্রান্ত কার্য ছাড়াও গণসংযোগকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠানের ভিতরের ও বাইরের ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মতামত বিনিময় করেন।

২। তথ্য সংশ্লিষ্ট ভূমিকা (*InformationalRoles*) ঃ তথ্য সংগ্রহ ও আদান প্রদান সংশ্লিষ্ট ভূমিকাকে ব্যবস্থাপকগণের তথ্য সংশ্লিষ্ট ভূমিকা বলে। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে একজন ব্যবস্থাপক বিভিন্ন পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে ভূমিকা রাখেন। সকল তথ্য তার কাছে থাকায় তাকে স্নায়ুকেন্দ্র *(Nurve centre)* হিসাবে ভূমিকা পালন করতে হয়। এছাড়া প্রয়োজনীয় নির্দেশ, পরামর্শ, তথ্য ইত্যাদি নিচের স্তরে জানানো, ব্যাখ্যা প্রদান ও মতামত বিনিময়ের জন্য প্রচারক হিসেবেও তিনি ভূমিকা রাখেন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র হিসেবে তাকেই প্রতিষ্ঠানের বাইরের বিভিন্ন পক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য বা সংবাদ উপস্থাপন করতে হয়।

৩। সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা (*Decisional Roles*) ঃ ব্যবস্থাপককে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। উদ্যোক্তা হিসাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নেওয়ার স্বার্থে তিনি বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠানে নানান ধরনের সমস্যা বা আপত্তি দেখা দিতে পারে। সমস্যা মোকাবেলাকারি হিসেবে তাকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। উপকরণাদির বা সম্পদেও বন্টনকারী হিসেবে কোথায় কোন ধরনের নতুন উপরকণ, কি পরিমাণে প্রদান করা প্রয়োজন, এগুলো বিষয়েও নির্বাহী সিদ্ধান্ত নেন। এছাড়া আলোচক বা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে অন্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় মীমাংসা, চুক্তিসম্পাদন ইত্যাদি কার্যও তিনি সম্পাদন করেন।

সুপারভাইজারের ভূমিকা(*The Role of Supervisor*)

সুপারভাইজার হলেন এমন এক ধরণের নেতা যিনি সংগঠনের সর্বনিম্ন ব্যবস্থাপনা স্তরে অবস্থান করেন। সুপারভাইজারগণ অব্যবস্থাপক পর্যায়ের কর্মীদের তত্ত্বাবধান করে থাকেন। উচ্চ ব্যবস্থাপকগণ প্রাথমিকভাবে তাদের নিম্নে অবস্থানকারী ব্যবস্থাপকদের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। এর অর্থ হলো সুপারভাইজাররা কর্মীদের সাথে সরাসরি জড়িত। একজন সুপারভাইজারের প্রধান কাজ হলো তার অধঃস্তনদের তত্ত্বাবধান করা। তাদের সাংগঠনিক অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন জনে পৃথক পৃথক মত প্রকাশ করেন। তবে তারা যেহেতু ব্যবস্থাপনার সর্বনিম্ন স্তরের ব্যবস্থাপক সেহেতু তাদের কার্যাবলী ব্যবস্থাপকদের কার্যাবলীর চেয়ে একটু ভিন্ন প্রকৃতির। আবার তাদের কার্যাবলীর সাথে কর্মীদের কার্যাবলীরও মিল নেই। তারা কর্মীদের তত্ত্বাবধান করে থাকেন।

সুপারভাইজারদের অন্যান্য ব্যবস্থাপকের মত নেতা হওয়ার প্রয়োজন পড়ে। তারা একদিকে যেমন ব্যবস্থাপকদের মত কাজ করতে পারেন না, তেমনি অন্যদিকে কর্মচারীও নহেন। তাই অপেক্ষাকৃত জটিল তাদেরপদটি। সুপারভাইজার না থাকলে কর্মীদের সরাসরি নির্দেশনা দানের কোন লোক থাকে না। তারা কর্মীদের সাথে থেকে হাতে কলমে তাদের কাজ করিয়ে নেন। তারা একদিকে ব্যবস্থাপকদের আদেশ বাস্তবায়ন করেন, আবার অন্যদিকে কর্মীদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসাবেও পরিগণিত হন। অতএব যে কোন সংগঠনে সুপারভাইজারের অবস্থান অত্যন্ত জটিল এবং গুরুত্বপূর্ন। কারণ তাদের ভূমিকার অভাবে কর্মচারীরা কার্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং এক পর্যায়ে কার্যে মনোযোগ হারিয়ে ফেলে।

সুপারভাইজারের নেতৃত্বের ভূমিকা (*Supervisor's Leadership Role*)

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে সুপারভাইজারের ভূমিকা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সুপারভাইজারগণ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা দলেই থাকেন। তারা অন্যের কাজ পরিচালনা করেন। আবার ব্যবস্থাপনা এবং কর্মচারীদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্কও রক্ষা করেন। এই দিক থেকে তাদেরকে মূল ব্যক্তি(*Key Person*) বললে অত্যুক্তি হয় না। আবার তারা মধ্যম ব্যক্তি (*Middle Man*) হিসাবে দ্বিমুখী কার্যের সম্মুখীন হয়। অন্যদিকে কর্মীদের সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করার জন্য তাদেরকে আচরণমূলক বিশেষজ্ঞ হতে হয়। এসব ধারণা থেকে বলা যায় একজন সুপারভাইজার প্রতিষ্ঠানের মূলফলক।

হ্যান্ডআউট ১.৪ ঃ পরিকল্পনা(Planning)

পরিকল্পনা*(Planning)*

ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার প্রথম ও প্রধান কাজ হলো পরিকল্পনা। এটি ভবিষ্যৎ করণীয় কাজের ভিত্তিস্বরূপ। যেকোন কাজ শুরুর আগেই ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন পড়ে। ঝোঁক বা আবেগের বশে কোন কাজ করলে তা হতে কখনই ভালো বা বড় কিছু অর্জন সম্ভব নয়। তাই ভবিষ্যতে কী করতে হবে, এ সম্পর্কে আগাম চিন্তা-ভাবনা করে করণীয় কাজ ঠিক করাকেই পরিকল্পনা বলে।

সাধারণ অর্থে, ভবিষ্যত কার্যক্রমের পূর্বনির্ধারিত নকশা বা চিত্রকে পরিকল্পনা বলে। ব্যাপক অর্থে, পরিকল্পনা হলো প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য নিরূপন ও তার বাস্তবায়নের জন্য কী করতে হবে, কীভাবে করতে হবে, কখন করতে হবে ও কত সময়ে করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ের পূর্বনির্ধারিত প্রতিচ্ছবি।

পরিকল্পনার সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণ করলে পরিকল্পনা সম্পর্কে নিম্নোক্ত ধারণা লাভ করা যায় ঃ

১. পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যৎ করণীয় কী হবে তা আগাম নির্ধারণ করা;
২. প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী নির্ধারণ, যেমন পরিকল্পনা তেমনি তা অর্জনের জন্য করণীয় সকল কাজের পূর্ব নির্ধারণও পরিকল্পনা;
৩. পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ পূর্বানুমানের সঙ্গে সম্পর্কিত। এরূপ পূর্বানুমান অবশ্যই বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী ও বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় নির্ধারণ করা হয়।

বিভিন্ন ধরণেরপরিকল্পনা

১. দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা

- অপারেশনাল প্ল্যানিং যা একটি সংস্থার কার্যাবলী এবং মানব সম্পদ এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন।
- দৈনন্দিন পরিকল্পনা যেখানে নির্দিষ্ট কিছু কাজ তাৎক্ষনিকভাবে সম্পাদন করা প্রয়োজন।

২. কৌশলগত পরিকল্পনা এবং দীর্ঘ সময় ব্যাপী পরিকল্পনা যা ভবিষ্যমুখী এবং যা সম্পূর্ণ সংস্থার জন্য প্রযোজ্য। এই পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার উচ্চ পর্যায়ের জন্য বেশী প্রযোজ্য যা গভীরভাবে পর্যালোচনা করা হয় এবং ৫-১০ বৎসরের জন্য প্রণীত হয়।

৩. আবর্তনীয় বা পৌনপৌনিক (*Recurrent or Cyclical planning*) পরিকল্পনা যা নিয়মিত প্রয়োজন হয়। যেমন- মাসিক বা ত্রৈমাসিক পরিকল্পনা।

৪. প্রকল্প পরিকল্পনা নির্দিষ্ট সময় এর জন্য প্রণয়ন করা হয়।

৫. আপদকালীন (*Contingency*) পরিকল্পনা যা সচরাচর দেখা যায় না কিন্তু তৈরী করে রাখতে হয়।

পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ "টুল" যা ব্যবস্থাপকদের দায়-দায়িত্ব এর উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়।

উত্তম পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ*(Features of a Good Plan)*

পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ কার্য হিসেবে বিবেচিত। কারন, পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজ সম্পাদিত হয়। তাই পরিকল্পনা ভালো না হলে অন্যান্য কাজ হতেও যুক্তিযুক্ত সাফল্য আশা করা যায় না। একটি আদর্শ পরিকল্পনার নিম্নলিখিত গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন ঃ

১. সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য *(Specific objective)* ঃ পরিকল্পনা প্রণয়নে এর সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য প্রথমেই নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক। উদ্দেশ্যবিহীন পরিকল্পনা কখনই কার্যকর ফল দিতে পারে না।

২. সহজবোধ্যতা *(Easy understandability)* ঃ একটি উত্তম পরিকল্পনা অধঃস্তনদের পক্ষে সহজেই সহজবোধ্য হওয়া উচিত। প্রতিষ্ঠানে পরিকল্পনা তৈরী করেন উর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গ। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয় অধঃস্তন জনশক্তির মাধ্যমে। তাই সকল পর্যায়ে গৃহীত পরিকল্পনা যদি সহজবোধ্য না হয় তবে নিচের দিকে এর অনুসরণ কষ্টসাধ্য হয় এবং ভুলক্রটির সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য পরিকল্পনাবিদদেরকে এ বিষয়টি ভাবতে হবে।

৩. সমন্বয় ও যোগসূত্র *(Co-ordination and linkage)* ঃ প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরেই যেহেতু পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয় তাই একটি আদর্শ পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সকল স্তর বা বিভাগের মধ্যে সমন্বয় ও যোগসূত্র রক্ষা করা হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের মূল পরিকল্পনা পূর্ব সময়ে গৃহীত পরিকল্পনার সঙ্গে এবং বিভিন্ন স্তরে গৃহীত পরিকল্পনা মূল পরিকল্পনার সঙ্গে সমন্বিত হওয়া আবশ্যক।

৪. নিরবচ্ছিন্নতা *(Continuity)* ঃ নিরবচ্ছিন্নতা আদর্শ পরিকল্পনার একটি অত্যাবশ্যকীয় গুণ। পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণীত হতে হবে যাতে কখনই তার অনুপস্থিতি না ঘটে। পরিকল্পনার অনুপস্থিতি ব্যবস্থাপনার অপরাপর সকল কার্য প্রক্রিয়ায় জটিলতার সৃষ্টি করে। ধরা যাক, একটা ইউনিটে এক মাসের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। তাহলে পূর্ব মাসের পরিকল্পনা শেষ হওয়ার পূর্বে নতুন মাসের পরিকল্পনা তৈরী ও প্রস্তুত রাখতে হবে। তাই পরিকল্পনার সময়কাল যেখানে যাই হোক না কেন একটা পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই সেখানে নতুন পরিকল্পনা গৃহীত হয়। শুধুমাত্র সময়ের দৃষ্টিকোন থেকেই নয় আগের পরিকল্পনার সঙ্গে মিল রেখেও নতুন পরিকল্পনা গৃহীত হয়ে থাকে।

৫. নমনীয়তা *(Flexibility)* ঃ একটি আদর্শ পরিকল্পনাকে নমনীয় হওয়া উচিত। যে ভবিষ্যত অবস্থা পূর্বানুমান করে পরিকল্পনা প্রণীত হয় তা সব সময়ই না ঘটতে বা বিদ্যমান নাও থাকতে পারে। তাই পরিবর্তিত অবস্থায় যাতে গৃহীত পরিকল্পনা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে অবস্থা মোকাবিলা করা যায় সেভাবে এটি প্রণয়ন করা আবশ্যক।

৬. তথ্য নির্ভরশীল *(Based on information)* ঃ একটি আদর্শ পরিকল্পনা অবশ্যই তথ্য ও অভিজ্ঞতা নির্ভর হওয়া উচিত। অবাস্তব ধারণা বা খামখেয়ালির ওপর নির্ভর করে পরিকল্পনা প্রণীত হলে তা কার্যক্ষেত্রে সুফল প্রদান করতে পারে না। তাই পরিকল্পনা প্রণয়নে সচেতনভাবে বিগত পরিকল্পনা, তার ফলাফল, সমস্যা এবং ভবিষ্যত অবস্থা কি হতে পারে, এ জন্য অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ ও বিচার করে বিকল্প কার্যক্রম নির্ধারণ ও এর মধ্যে থেকে সঠিক বিকল্পকে পরিকল্পনা হিসেবে বাছাই করা হয়।

৭. **সঠিক পথ নির্দেশনা *(Proper guidance)*** ঃ প্রতিষ্ঠানের যে পর্যায়েই পরিকল্পনা প্রণীত হোক, তা তখনই আদর্শ পরিকল্পনা হবে যদি ঐ পরিকল্পনা এর অধীন লোকদের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রমের সহজ দিক-নির্দেশনা দান করতে পারে। যতদূর সম্ভব পরিকল্পনা বিশদভাবে বর্ণিত হওয়া উচিত।

৮. **বাস্তবমুখিতা *(Reality oriented)*** ঃ পরিকল্পনা অবশ্যই বাস্তবমুখী হওয়া উচিত। অবাস্তব, পরিকল্পনা সবার মাঝে তাৎক্ষনিক কিছুটা আশাবাদ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হলেও কার্যক্ষেত্রে তা কখনই কাঙ্খিত ফল দেয় না। বরং পরবর্তী সময়ে তা হতাশা ও নানান ধরনের জটিলতার সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রেই এমন পরিকল্পনা নেয়া হয় যা একান্তই কল্পনা-বিলাস ছাড়া কিছুই নয়।

৯. **গ্রহণযোগ্যতা *(Acceptability)*** ঃ পরিকল্পনা যাদের দ্বারা বাস্তবায়িত হবে তাদের কাছে এটি গ্রহণযোগ্য হবে কিনা একটি উত্তম পরিকল্পনায় তা সব সময়ই বিবেচনা করতে হবে। কর্মীরা যদি পরিকল্পনাকে কোন কারণে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে না পারে তবে তার সঠিক বাস্তবায়ন আশা করা যায় না।

১০. **স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ *(Cost Effective)*** ঃ একটি আদর্শ পরিকল্পনায় অবশ্যই কম ব্যয়ে সর্বোচ্চ ফলাফল প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকা আবশ্যক। নানান সুবিধা বিবেচনায় আলাদা পরিকল্পনা বিভাগ খোলা যেতে পারে। কিন্তু সেখানে অবশ্যই দেখতে হবে এরূপ বিভাগ খোলার ফলে যে অর্থ ও সময় ব্যয় হবে ফলাফলের ওপর তার প্রভাব কতটা।

পরিশেষে বলা যায়, একটি আদর্শ পরিকল্পনাকে অবশ্যই উপরোক্ত গুণসমৃদ্ধ হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় পরিকল্পনা পরিকল্পনাই থেকে যাবে, তার দ্বারা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন আশা করা হলেও তা দুরাশায় পরিণত হতে বাধ্য। আমাদের দেশে অনেক সময় সাড়ম্বরে পরিকল্পনা নেওয়া হয় বটে কিন্তু তাতে উপরোক্ত গুণ বা বৈশিষ্ট্য না থাকায় কার্যক্ষেত্রে তা যথেষ্ট ফল দিতে ব্যর্থ হয়।

পরিকল্পনা প্রণয়নের বিভিন্ন পদক্ষেপ

১। **বর্তমানের আলোকে ভবিষ্যৎ সুযোগ সুবিধা মূল্যায়ন *(Evaluation future opportunity in the light of present sitution)*** ঃ পরিকল্পনা একটি চিন্তনীয় কাজ। তাই পরিকল্পনা প্রণয়ণের জন্য পরিকল্পনাবিদকে প্রথমেই বিদ্যমান পরিকল্পনার কার্যকারিতা, সুযোগ-সুবিধা এবং ভবিষ্যৎ অবস্থা ও সমস্যাদি সম্পর্কে পূর্বেই পরিষ্কার ধারণা অর্জন করতে হয়। ব্যবস্থাপকগণ প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থায় বিদ্যমান সমস্যা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিকগুলোকে সুস্পষ্ট ও সম্পুর্ণরূপে জানার চেষ্টা করে।

২। **সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নির্ধারণ (Establishing clear objectives)**ঃ বিদ্যমান অবস্থা ও ভবিষ্যত সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে ধারণা গ্রহণপূর্বক তার আলোকে প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং সে অনুযায়ী বিভাগ ও উপ-বিভাগের উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠা পরিকল্পনার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

৩। **প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ (Collection and analysis of necessary information)**ঃ উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য এ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে হয়। পরিকল্পনাকে শুধুমাত্র অনুমান নির্ভর না করে তথ্যনির্ভর ও বাস্তবমুখী করার জন্য এ পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য প্রতিষ্ঠানের বিগত বছরগুলোর প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ের তথ্যচিত্র বিশ্লেষণ এবং প্রতিযোগী, বিক্রেতা, ভোক্তা ইত্যাদি পক্ষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়ে। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কাজে জড়িত অধঃস্তনদের কাছ থেকেও এ পর্যায়ে বিভিন্ন তথ্য ও পরামর্শ সংগ্রহ করা যেতে পারে।

৪। **ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুমান (Assumption regarding future)**ঃ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষনের সাথে সাথে পরিকল্পনা প্রণেতাগণকে এ পর্যায়ে ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি সম্পর্কে পূর্বানুমান করতে হয়। একেই পরিকল্পনার পটভূমি নির্ধারণ বলে। এ পর্যায়ে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অবস্থা নয় এর বাইরের বিভিন্ন পক্ষ যেমন- প্রতিযোগী, ক্লায়েন্ট, সরকারসহ বিভিন্ন পক্ষের অবস্থা ও তাদের সম্ভাব্য ভূমিকা কী হতে পারে এ সম্পর্কে অনুমান করার প্রয়োজন পড়ে।

৫। **বিকল্প কার্যপদ্ধতি স্থিরকরণ (Determining the alternative courses of actions)**ঃ অনুমিত অবস্থার মধ্য দিয়ে কিভাবে লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে এ জন্য বিভিন্ন বিকল্প কার্যপদ্ধতি এ পর্যায়ে নির্দিষ্ট করা হয়। ধরা যাক, ভবিষ্যতে কোন বিশেষ ধরনের সেবার চাহিদা ব্যাপকভাবে বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। এখন এই বর্ধিত চাহিদাতে কিভাবে একটা প্রতিষ্ঠান নিজেদেরকে তৈরী করবে এজন্য বিভিন্ন বিকল্প; যেমন- সেবার মূল্য কমানো, নূতন প্রযুক্তি, ও মানোন্নয়ন ইত্যাদি যেকোন বিষয় বিবেচনা করতে পারে। বিকল্পের সংখ্যা বেশী হলে তার মধ্য থেকে একবারে দুর্বল বিকল্প বাদ দিয়ে শক্তিশালী বিকল্পসমূহ নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে।

৬। **বিকল্পসমূহ মূল্যায়ন (Evaluating alternatives)**ঃ এক্ষেত্রে বাছাইকৃত বিকল্পসমূহ অনুমিত অবস্থা ও লক্ষ্যের আলোকে বিবেচনা করতে হয়। সাধারণ বিচারে কোন বিকল্প সর্বোত্তম মনে হলেও প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় ঐ বিকল্প গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। বিকল্পসমূহ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে ঃ

ক. গৃহীত বিকল্প প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে কীভাবে সমন্বয় করা হবে;
খ. ব্যয়, কাজের গতি এবং সেবার মানের বিষয়ে বিকল্প পরিকল্পনাটি কতটুকু সন্তোষজনক হবে এবং
গ. নতুন যন্ত্র প্রযুক্তি সংগ্রহের ক্ষেত্রে তা প্রতিষ্ঠানের কাজকে কিভাবে আরো অধিক সম্প্রসারণে সহায়তা করবে।

৭। **সর্বোত্তম বিকল্প গ্রহণ (Selecting the best alternative)** ঃ বিকল্পসমূহ মূল্যায়নের পর এ পর্যায়ে সর্বোত্তম বিকল্প বাছাই করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের বাস্তব অবস্থাকে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। সর্বোত্তম বিকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে ঃ

ক. বিকল্পটি পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের মতো যথেষ্ট নমনীয় কিনা;
খ. উক্ত বিকল্পটি কার্যসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা; ও
গ. সেটি বাস্তবায়নে কী ধরণের নতুন যন্ত্রপাতি, জায়গা, কর্মী, প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন হবে।

৮। **সহায়ক পরিকল্পনা গ্রহণ (Preparing derivative plans)**ঃ মৌলিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়োজনে অনেক সময় প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সহায়ক পরিকল্পনা প্রয়োজন পড়ে। সেক্ষেত্রে এ পর্যায়ে এরূপ পরিকল্পনা তৈরী করতে হয়। ধরা যাক, একটি হাসপাতালে কয়েকটা নতুন যন্ত্র ক্রয়ের পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে। এখন এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কতকগুলো সহায়ক পরিকল্পনা নিতে হবে; যেমন কর্মী সংগ্রহ, তাদের প্রশিক্ষণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন সুবিধা সৃষ্টি।

৯। কার্যারম্ভের সময় ও কার্যক্রম নির্ধারণ (Determining the time and programmes of commencement)ঃ এ পর্যায়ে ব্যবস্থাপক পরিকল্পনাকে সামনে রেখে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নির্ধারন করেন এবং সেগুলোকে ধারাবাহিকভাবে সাজান। অতঃপর প্রত্যেক কাজের শুরু ও সমাপনের সময় নির্দিষ্ট করা হয়। এটি পরিকল্পনাকে বিশদ রূপ দান করে। অবশ্য এরূপ কার্যক্রম ও সময় নির্ধারণ অধঃস্তনরা সহজে গ্রহণ করবে কিনা তা বিবেচনা করতে হয়, অতঃপর তা লিখিতভাবে ধারাবাহিক ও সময়ানুক্রমিক সাজানো হয়। যা একটি কার্যকর পরিকল্পনার রূপ পরিগ্রহ করে।

১০। প্রণীত পরিকল্পনার পরীক্ষামূলক প্রয়োগ (Pilot running of the plans formulated)ঃ কখনও কখনও গৃহীত পরিকল্পনা স্থায়ীরূপে প্রয়োগ না করে পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা হয়। অনুমিত অবস্থার আলোকে যথাযথভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কোন সমস্যা দেখা দেয় কিনা তা বিচার করাই এরূপ পদক্ষেপের লক্ষ্য।

১১। বাজেট প্রণয়নঃ পরিকল্পনার আংশিক উপস্থাপন হলো বাজেট। যেহেতু পরিকল্পনায় জনশক্তি ও অন্যান্য উপকরণাদির খরচাদি অন্তর্ভূক্ত তাই অর্থ সংস্থানের উৎস ও ব্যয়ের খাতগুলি সম্পর্কেও চিন্তা করা দরকার। বাজেটের উপর কর্মসূচীর আকৃতি নির্ভর করে। বাজেট বিভিন্ন বিভাগীয় হতে পারে।

১২। স্বতঃস্ফুর্ত সাড়া দেয়াঃ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সহিত জড়িত ব্যক্তিবর্গের অনুকুল সাড়া লাভের জন্য চুড়ান্তভাবে গৃহীত পরিকল্পনা তাদের নিকট বোধগম্য করতে হবে। তবেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্বতঃপ্রনোদিত সাড়া মিলতে পারে।

১৩। কার্যকারিতা মূল্যায়ন ও সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ (Evaluating of effectiveness and taking corrective action)ঃ এ পর্যায়ে পরীক্ষামূলভাবে প্রয়োগকৃত পরিকল্পনার কার্যকারিতা মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়। অতঃপর পরিকল্পনাকে স্থায়ীভাবে প্রয়োগযোগ্য হিসেবে ধরা হয়। যদিও ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ থাকে।

বড় ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়নকালে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন তা একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হলো ঃ

সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সতর্কতা

প্রতিযোগীতা
চাহিদা
আমাদের শক্তিসমূহ ও দুর্বলতাসমূহ

লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্ধারণ

কোথায় যেতে হবে
কিভাবে এবং কখন শেষ করতে হবে

পরিকল্পনার আঙ্গিনাসমূহ স্থাপন

অভ্যন্তরীন না বহিঃস্থ

বিকল্প চিহ্নিতকরণ

আমাদের উদ্দেশ্যের সাথে
সামঞ্জস্যপূর্ণ সর্বাধিক অবদানক্ষম
বিকল্প

লক্ষ্যে আলোকে বিকল্প মূল্যায়ন

কম ব্যয়ে ও সার্বাধিক লাভে যে
বিকল্পটি সবচেয়ে বেশী সুযোগ দিবে।

শ্রেষ্ঠ বিকল্প নির্ণয়

শ্রেষ্ঠ কর্মসূচী বেছে নিতে হবে।

সহায়ক কর্মসূচী নির্ধারণ

যন্ত্রপাতি ক্রয়
কর্মী নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ
নতুন সেবা উন্নয়ন

বাজেট প্রণয়ন

নির্ধারণ

একজন নার্স ব্যবস্থাপক কেন পরিকল্পনা করবেন ?

সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য

দেখা গেছে যে, হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নার্স নাই এবং পর্যাপ্ত ঔষধপত্র, ইক্যুইপমেন্ট নাই। তাই এগুলো যথাযথ এবং কার্যকরভাবে ব্যবহারের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং এর বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

হ্যান্ডআউট ১.৬ ঃ সময়ব্যবস্থাপনা (Time Management)

সময় ব্যবস্থাপনা কেন?

অন্য যে কোন সম্পদের মত সময় একটি অত্যন্ত সীমিত এবং মূল্যবান সম্পদ। অধিকাংশ ব্যবস্থাপক অভিযোগ করেন যে তাদের হাতে যথেষ্ট সময় নেই।

সব ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব হল লক্ষ্য অর্জন করা। এসব লক্ষ্য সব সময়েই নির্দিষ্ট সময়ের হিসাবে স্থির করা হয়; প্রতি ঘন্টা, একটি নির্দিষ্ট সময় বা নির্ধারিত তারিখ হিসেবে। কাজেই সময় হল দক্ষতার একটি মাপকাঠি এবং বিভিন্ন সেবা, বিভাগ, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক দক্ষতার সূচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

তিনিই দক্ষ ব্যবস্থাপক যিনি অল্প সময়ে অধিক কাজ সম্পাদন করতে পারেন।

সময় একটি বিশেষ সম্পদ। এর ব্যবহার অবশ্যই পরিকল্পিত, নিয়ন্ত্রিত ও হিসাব মাফিক হতে হবে। সম্পদ হিসেবে এটা অন্য বাণিজ্যিক বা শিল্প সম্পদেরই মত। শুধু তফাৎ হল সময় কেনা যায় না, বিনিময় করা যায় না কিন্তু এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

সময় কোথায় যায় ?

সময়ের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে জানতে হবে সময় কোথায় যায়? সময়ের ব্যবহারকে দুটো প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ-

- প্রয়োজনীয় কাজে যে সময় ব্যয় হয়;
- অপ্রয়োজনীয় কাজে সেই সময় নষ্ট হয়;

অবশ্যই, প্রয়োজনীয় কাজে যে সময় ব্যয় হয় তার পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং প্রয়োজনীয় লক্ষ্য অর্জনের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। অন্যদিকে অপ্রয়োজনীয় কাজে যে সময় নষ্ট হয় তার পরিমাণ কমাতে হবে।

প্রয়োজনীয় কাজকে আবার চার ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

ক. রুটিন কাজঃঅনেক অত্যাবশ্যকীয় কাজ যেমন রিপোর্ট তৈরী করা, টেলিফোনের জবাব দেয়া এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কাজসমূহ রুটিন কাজ এর অন্তর্ভূক্ত। এগুলি সাধারণতঃ গুরুত্বপূর্ণ কাজ, তথাপি এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে; নতুবা গুরুত্বের তুলনায় এসব কাজে বেশী সময় ব্যয় হতে পারে।

খ. মূখ্য কাজসমূহঃ প্রত্যেক কাজে এমন কতগুলো মূখ্য অংশ থাকে যার উপর সেই কাজের ফলাফল নির্ভর করে। সেই মূখ্য অংশগুলো হলো- নির্দেশ প্রদান, কর্মী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা, কর্ম পরিকল্পনা, কর্ম সম্পাদন, নিরীক্ষা, কর্মী প্রশিক্ষণ, বিরোধ নিষ্পত্তি প্রভৃতি। দুর্ভাগবশতঃ সময়ের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকার ফলে বহু ব্যবস্থাপক এসব অত্যাবশ্যকীয় কাজে খুব কম সময় দিতে পারেন।

গ. বিশেষ প্রকল্পসমূহঃ বহু ব্যবস্থাপককে সময় সময় বিশেষ প্রকল্পের দায়িত্ব দেয়া হয়। এর ফলে তারা অন্যান্য মূখ্য কাজের জন্য যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না।

ঘ. সৃজনশীল কাজঃ একজন সফল ব্যবস্থাপক তার কল্পনা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে ক্রমাগত উন্নতি আনয়নের চেষ্টা করতে পারেন। এজন্য ব্যবস্থাপকের উদ্ভাবনী চিন্তা-ভাবনার জন্য সময় প্রয়োজন।

৩. সময় কিভাবে নষ্ট হয় ?

(ক) মূখ্য কাজের উপর মনোযোগ দিতে ব্যর্থতা
(খ) দায়িত্ব অর্পনে ব্যর্থতা
(গ) যোগাযোগে ব্যর্থতা
(ঘ) আগাম পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যর্থতা
(ঙ) সময় নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা

৪. সময় ব্যবস্থাপনা উন্নত করার কতিপয় কৌশল

- **ব্যক্তিগত সময় নিরীক্ষাঃ** সময় ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে করতে হলে আগে বের করুর; সময় কোথায় যায়? প্রত্যহ কোন কাজে কত সময় ব্যয় হয়, এক সপ্তাহব্যাপী তার একটি তালিকা তৈরী করুন।

- **নিজস্ব টাইম বাজেট তৈরী করুনঃ** চার ধরনের সময় নির্ধারন করুন- রুটিন কাজ, মূখ্য কাজ, বিশেষ প্রকল্প ও সৃজনশীল কাজ। একটি সুষম সময় বাজেট অনুসরন করতে চেষ্টা করুন, যাতে উক্ত চার ধরনের কাজের জন্য যথাযথ মনোযোগ দিতে পারেন।

- **যোগাযোগঃ** দক্ষভাবে যোগাযোগ করুন যাতে ভুল বুঝাবুঝি কম হয়, একাধিকবার যোগাযোগের ফলে অযথা সময় নষ্ট হয়, তবে ক্ষতিকারক ভুল নিরসন করা যায়।

- **পেপার ওয়ার্ক কমানঃ** যে সকল নোট বা প্রতিবেদনে কিছু আসে যায় না, সেগুলো বর্জন করুন। সত্যিকার প্রয়োজনীয় যোগাযোগের উপর মনোনিবেশ করুন, যাতে কাঙ্খিত ফল লাভে সুবিধা হয়। যেখানে সম্ভব অপ্রয়োজনীয় ফরম, রেকর্ড, ডকুমেন্ট প্রভৃতি বর্জন করুন, জটিল ফরম বা রিপোর্টকে সহজতর করুন এবং দুই তিনটি বিষয় একীভূত করে রিপোর্টের সংখ্যা কমিয়ে ফেলুন।

- **সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিনঃ** দক্ষ ব্যবস্থাপকগণ দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, ছোটখাট ব্যাপার দ্রুত নিষ্পত্তি করেন। ক্ষুদ্র বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দীর্ঘ সময়ক্ষেপন করবেন না।

- **বিঘ্ন নিয়ন্ত্রণ করুনঃ** নির্ধারিত বিষয়ে মনোনিবেশ করুন, টেলিফোনে আলাপ প্রয়োজনীয় বিষয়ে সীমিত রাখুন, জরুরী নয় এমন যোগাযোগ অবসর সময়ের জন্য রেখে দিন; সামাজিক আলোচনা মধ্যাহ্ন বিরতির সময় করুন এবং অনুরূপ রুটিন যোগাযোগ ও বিঘ্নতার জন্য আপনার বাজেটের সময়ের ব্যবস্থা রাখুন। সর্বোপরি, অপ্রয়োজনীয় বিঘ্নতা এড়ানোর ব্যাপারে দৃঢ় হউন।

- **বিশেষ কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারন করুনঃ** বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করুন।

- **চেকলিষ্ট ব্যবহার করুনঃ** পরিকল্পিত কার্যাবলী লিখে রাখুন এবং কোন সময়ে কোন কাজটি করতে হবে তার জন্য এটিকে চেকলিষ্ট হিসেবে ব্যবহার করুন। যদি কোন একটি কাজ নির্ধারিত সময়ে করা না হয় তবে ঐ কাজের গুরুত্ব এবং সময়মত কাজ করার দক্ষতা কমে যায় ।

নিজস্ব সময় নিরীক্ষণ ছক - ১ পূরণের নির্দেশনাবলী

ছুটির দিনসহ পুরো এক সপ্তাহ যাবত ছক:১ পূরণ এবং বিশ্লেষণ করবেন। প্রতিদিনের জন্য একটি করে ছক ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে ছকটি ফটোকপি করে নেবেন।

সমস্ত দিন আপনি আপনার বিভিন্ন কার্যাবলী যখন যা করেন তা ছকে লিখে রাখবেন। দিন শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না এবং সারাদিন কি করেছেন দিনের শেষে তা পূরণ করতে/লিখতে চেষ্টা করবেন না। এমনটি করা প্রকৃত সময় নিরীক্ষণের জন্য সহায়ক নয়।

প্রথম কলামে প্রত্যেকটি কাজ লিখুন - যেমন : ঘুম থেকে ওঠা, গোসল করা, নাস্তা খাওয়া, ছেলেমেয়েদেরকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া, অফিসে যাওয়া, সভায় যোগ দেয়া, অফিসের কাজে বাইরে যাওয়া, বাজার করা ইত্যাদি। টেলিফোন করা, বাজেট পরিকল্পনা করা, চিন্তাভাবনা করা ইত্যাদিও লিখবেন।

প্রত্যেকটি কাজ যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে লিখবেন। যেমন : মিটিং থাকলে কি ধরনের বা কি উপলক্ষে মিটিং, কাদের সাথে মিটিং ইত্যাদি।

কলাম ২ এবং ৩-এ প্রত্যেকটি কাজ কখন শুরু হল এবং কখন শেষ হল সেই প্রকৃত সময় উল্লেখ করবেন।

কলাম ৫ পূরণ করতে ভূলবেন না। সেখানে উল্লেখ করবেন কাজের সময় কি কি বিঘ্ন ঘটেছে যথা : বাইরে থেকে ফোন আসলো, কেউ কথা বলতে বা দেখা করতে এলো, ট্রাফিক জ্যাম ইত্যাদি।

দিনের শেষে কার্যাবলী বিশ্লেষণ করতে **১৫** মিনিটের বেশী সময় লাগবে না।

প্রতিটি কাজে মোট যত সময় লাগলো তা কলাম ৪-এ লিখবেন। যে কাজটি করলেন সেটার যদি আগেই পরিকল্পনা করা থাকে তা হলে ৬ নং কলামে **"P"** লিখবেন, আর অপরিকল্পিত হলে ৬ নং কলামে **"U"** লিখবেন।

৭ নং কলাম একটু ভেবে-চিন্তে পূরণ করবেন। প্রত্যেকটি কাজ বিশ্লেষণ করতে নিম্নলিখিত কোড বা সংকেত ব্যবহার করবেন।

A - আমি ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করেছি।
B - কাজটি অন্য সময়ে করলে ভাল হতো।
C - এই কাজটি করা প্রয়োজনীয় ছিল না।
D - অন্য কাউকে এই কাজটি করতে বলা উচিত ছিল।

অতিরিক্ত কোন মন্তব্য থাকলে ৮ নং কলামে লিখে রাখবেন। যেমন - কাজটি করতে আমার ধারণার চেয়ে কম/বেশী সময় লেগেছে, এটা একটি বিশেষ পরিস্থিতি, ইত্যাদি। সততার সাথে মন্তব্যগুলো লিখবেন।

যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে উপরোক্ত অনুশীলনীটি সম্পন্ন করবেন। যথাযথভাবে করতে পারলে সময় ব্যবস্থাপনার উপরোক্ত বিশ্লেষণ সারা জীবন আপনার কাজে লাগবে। যদি ভুল তথ্য পরিবেশন করেন তবে উক্ত অনুশীলনী আপনার কোন কাজে লাগবে না। নিচে সময় ব্যবহারের একটি উদাহরণ দেয়া হলো।

সময়কে সাধারণতঃ যেভাবে ব্যয় করা হয় ঃ

সপ্তাহে আমরা মোটামুটি ৩৯ ঘন্টা এবং বৎসরে ৪৮ সপ্তাহ অফিসিয়াল কাজ করি। তাতে বৎসরে মোট অফিসিয়াল কাজে সময়ের পরিমান দাড়ায় ৩৯ x ৪৮ = ১৮৭২ ঘন্টা।

বছরে আমরা অফিসিয়াল কাজে ব্যয় করি	১৮৭২ ঘন্টা
বছরে কর্মস্থলে যাওয়া আসা (প্রতিদিন ৪০ মিনিট হিসাবে)	১৯২ ঘন্টা
বছরে খাওয়া দাওয়া (প্রতিদিন ৩ ঘন্টা হিসাবে)	১০৯৫ ঘন্টা
বছরে পোষাক পরিধান ও পরিবর্তন (প্রতিদিন ১ ঘন্টা হিসাবে)	৩৬৫ ঘন্টা
বছরে রাতে ঘুমানো (প্রতি রাতে ৮ ঘন্টা হিসেবে)	২৯২০ ঘন্টা
বছরে সর্বমোট সময় ব্যয় হয়	**৬৪৪৪ ঘন্টা**
বছরে মোট সময় (২৪ x ৩৬৫) =	৮৭৬০ ঘন্টা

সুতরাং অবশিষ্ট (৮৭৬০-৬৪৪৪) ২৩১৬ ঘন্টা সময় আমরা আমাদের ইচ্ছামত ব্যয় করতে পারি, যা বছরের মোট সময়ের ২৬% বা ৯৬টি পূর্ণ দিন।

ছক-১ দৈনিক বিশ্লেষণ শীট দিবস ১২৩৪৫৬৭ তারিখ ঃ .... নাম ঃ ....

রেকর্ড বিশ্লেষণ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
কার্যাবলী	শুরু	শেষ	মেয়াদ ঘন্টা/মিনিট	কার দ্বারা বিঘ্ন ঘটেছে এবং কতক্ষণ?	পরিকল্পিত/ অপরিকল্পিত	বিশ্লেষণ কোড সংকেত	মন্তব্য

নিজস্ব টাইম অডিট বিশ্লেষণ ছক-২

কাজের ধরণ	এই কাজে ব্যয়িত মোট সময়	১৬৮ ঘন্টার % (শতকরা কত ভাগ)	মন্তব্য (অবাক? আহত? প্রত্যাশিত, আশানুরূপ, আশানুরূপ নয়)

নিজস্ব টাইম অডিট বিশ্লেষণ ছক-৩

১. ছক: ১ এর ৭ নং কলামের কোডগুলো পরীক্ষা করুন। এগুলো কি এখনো প্রযোজ্য? উদাহরণস্বরূপ, আপনি যা করেছেন, অন্য কেউ কি একই কাজ করছে, যার ফলে আপনি যা করেছেন তা অপ্রয়োজনীয় বলে গণ্য হয়েছে।

২. আপনি কি অফিসের সময়সূচীর বাইরেও কাজ করেছেন? বাড়িতে কাজ নিয়ে গিয়েছিলেন? যদি তাই হয়, তাহলে কেন করেছেন?

৩. আপনি কি গুরুত্ব অনুসারে কাজ করেন, না যখন যে কাজ আসে, তখন সেই কাজ করেন?

৪. আপনি কি কোন কোন কাজের বেলায় সময়ের হিসাব করতে ভুল করেন? উদাহরণস্বরূপ্ আপনার ধারণার চাইতে অনেক বেশীক্ষণ ধরে মিটিং চলে? টেলিফোনে আলাপ সংক্ষিপ্ত করতে কি অসুবিধা বোধ করেন?

৫. কাজের সময় আপনি কি এত বেশী বিঘ্নের শিকার হন যে মূল কাজে যথাযথভাবে মনোনিবেশ করতে পারেন না?

৬. বিভিন্ন কাজে আপনি যে সময় ব্যয় করেন, তা কি সব সময় কাজের গুরুত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

৭. কতটুকু সময় আপনি পরিকল্পনা মাফিক ব্যয় করেন এবং কত সময় অন্যের চাহিদা অনুযায়ী বা অপরিকল্পিতভাবে ব্যয়িত হয়?

৮. আপনি কি দক্ষভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে পারেন? এটা কি আপনার কাছে কঠিন মনে হয়?

৯. আপনি কি অন্যের সময় নষ্ট করেন?

১০. আপনি কি "গুরুত্বপূর্ণ" ও "জরুরী" কাজ মিশিয়ে ফেলেন? যেমন জরুরী কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ কাজকে অগ্রাধিকার দেন?

কিভাবে সময় বিভাজনকে উন্নত করা যায়?

ঘুমানো	খাওয়া-দাওয়া	গোসল/পোশাক পরিধান
কাজ	বাজার করা	গৃহস্থালি কাজ
পড়াশুনা	টিভি দেখা	রান্ন-বান্না
গল্প-গুজব	সামাজিকতা	বেড়ানো

হ্যান্ডআউট ১.৭ ঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision Making)

সংজ্ঞা

ব্যবস্থাপকীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ এর আভিধানিক অর্থ হলো ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কোন প্রশ্নের সমাধান দেওয়া। ব্যবস্থাপনার পরিভাষায় এর অর্থ হলো- যেকোন প্রতিষ্ঠানের কোন সুনির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য সঠিক কর্মপন্থা নির্ধারণ করা। যে কোন সমস্যা সমাধানে বা কর্মপন্থা গ্রহণে ব্যবস্থাপনার সামনে একাধিক বিকল্প থাকে। সকল অবস্থা বিবেচনায় এক্ষেত্রে সর্বোত্তম বিকল্প বাছাইকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলে।

পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুযায়ী বিকল্প ব্যবস্থাগুলোকে চিহ্নিত করে তার মধ্য থেকে উত্তম বিকল্প বাছাই করার প্রক্রিয়া হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ হলো একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা ব্যবস্থাপক সাংগঠনিক সমস্যা চিহ্নিত করেন এবং সেগুলো সমাধানের উদ্যোগ নেন।

একটা প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যপরিচালনা, ব্যবস্থাপকীয় ও সাংগঠনিক সমস্যার সমাধান এবং দীর্ঘমেয়াদে এর সাংগঠনিক লক্ষ্যার্জনে প্রয়োজনীয় কর্মব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিকল্প কার্যধারাসমূহ চিহ্নিতকরণ, মূল্যায়ন ও সর্বোত্তম বিকল্পটি নির্বাচন এবং তার ফলপ্রসূ বাস্তবায়নে কর্তব্যকর্ম নির্ধারণের কাজকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলে।

সিদ্ধান্তকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) **নির্দিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত ঃ** এটা সংগঠনের পলিসি বা রুলস এর উপর নির্ভরশীল।

(২) **অনির্ধারিত সিদ্ধান্ত ঃ** এটা হয় নূতন নূতন ঘটনার প্রেক্ষাপটে যা সম্পর্কে আগে থেকে বলা যায় না এবং যা সব সময় ঘটে না।

সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিবেচ্য বিষয়

সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর প্রতিষ্ঠানের কার্যফলপ্রদতা ও লক্ষ্যার্জন নির্ভর করে। একজন ব্যবস্থাপক কতটা দক্ষ তাও এর দ্বারা প্রমানিত হয়। তাই ব্যবস্থাপকগণ সিদ্ধান্তগ্রহণে অত্যন্ত সতর্ক থাকেন এবং প্রয়োজনীয় বিবেচ্য বিষয়সমূহ সতর্কভাবে বিবেচনার প্রয়াস পান। নিম্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রধান প্রধান বিবেচ্য বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলো ঃ

১. সমস্যার প্রকৃতিঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ মানেই কোন প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যার সর্বোত্তম সমাধানের পন্থা নির্বাচন করা। সমস্যার প্রকৃতির ওপর সমাধানের পন্থা নির্ভরশীল। এ কারণে সমস্যা কি ধরনের তা নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

পিটার ড্রাকার প্রতিষ্ঠানের নিম্নোক্ত চার ধরনের সমস্যা চিহ্নিত করেছে ঃ

ক. পৌনঃপুনিক সমস্যা ঃ যেসব সমস্যা নিয়মিত দেখা দেয় সেগুলো এ ধরনের সমস্যার মধ্যে পড়ে। মজুদ জিনিসপত্র সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত, কর্মী নিয়োগ, ছুটি বা অবকাশকালীন প্রতিষ্ঠান বন্ধ, কর্মীদের অভিযোগ ইত্যাদি সমস্যা এর উদাহরণ।

খ. চাকুরি পরিবর্তন, অন্য সংস্থারবা বিভাগের সঙ্গে একীভূত হওয়া, কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত নথীকরণব্যবস্থা চালু করা ইত্যাদি এ ধরনের সমস্যার উদাহরণ।

গ. অন্যান্য বা ভিন্নধর্মী সমস্যা ঃ অগ্নিকান্ড, অর্থ ব্যয়, কর্মী অসন্তোষের কারণে হাঙ্গামা ইত্যাদি সমস্যা এর আওতাধীন।

ঘ. ভিন্নধর্মী সমস্যা যা পৌনপুনিক হতে পারে ঃ কোন নতুন ব্যবস্থাপক সম্পর্কে কর্মচারীদের অভিযোগ, প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় ত্রুটি ইত্যাদি এ ধরনের সমস্যার মধ্যে পড়ে।

২. **ভবিষ্যত অবস্থা** ঃ এ ধরনের সিদ্ধান্ত ভবিষ্যত সময়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই ভবিষ্যত অবস্থা কিরূপ হবে তা বিশদভাবে বিবেচনা করতে হয়। সাধারণত তিন ধরনের ভবিষ্যত অবস্থা দেখা যায় যা সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। যা হলো নিশ্চয়তা, ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা।

৩. **সামর্থের সীমাবদ্ধতা** ঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর যৌক্তিক আচরণের একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। পরিস্থিতি সম্পর্কে তার পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান বা তথ্য থাকা সর্ব অবস্থায় সম্ভব নয়। তাই এটি মেনেই বিদ্যমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

৪. **সুসংবদ্ধ চিন্তা ও পদ্ধতি** ঃ নির্বাহী বা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে সুসংবদ্ধ চিন্তা-ভাবনাকারী হিসেবে সমস্যাটিকে অত্যন্ত নিয়মসিদ্ধ পন্থায় বিশ্লেষণ করতে হয়। সুসংবদ্ধ চিন্তাকারী পদ্ধতির ওপর নির্ভর করেন, সমস্যা সমাধানে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, ব্যবহৃত পদ্ধতিতে সমাধানের পন্থা ব্যাখ্যা করেন এবং সঠিকভাবে তা বিশ্লেষণ করেন।

৫. **সিদ্ধান্তের লক্ষ্য নির্দিষ্টকরণ** ঃ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কার্যকরভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কতিপয় সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সেসব লক্ষ্যের প্রতিফলন ঘটাতে হয়। এসব সিদ্ধান্ত লক্ষ্যসমূহ হলো ঃ

ক. গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জনকারী উপাদানের ওপর আলোকপাত
খ. সকল স্তরের কর্মীরা যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারে তার ব্যবস্থাকরণ;
গ. প্রত্যেকটি স্তরে বড় ধরনের কোন সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও
ঘ. সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থাকে সহজকরণ এবং ব্যবস্থাপকদের মাঝে পারস্পরিক আস্থা সৃষ্টি।

৬. **সহযোগীতা** ঃ সিদ্ধান্তের সফল বাস্তবায়নের জন্য অধীনস্তদের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। তাই সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সহযোগিতা অর্জন করার জন্য ঐকমত্যভিত্তিক ও বিকেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রাধান্য দেয়া আবশ্যক।

৭. গ্রহণযোগ্যতা ঃ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য না হলে সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। তাই বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।

৮. পর্যাপ্ত সময় ঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি জটিল ও সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয়া প্রয়োজন। বিশেষতঃ কর্মসূচিভিত্তিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সময় পাওয়া না গেলে সঠিক ও নির্ভুলভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

৯. নমনীয়তাঃ বর্তমান সময়ে সাংগঠনিক পরিস্থিতি অত্যন্ত গতিময় ও পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সিদ্ধান্ত কর্মসূচী এমনভাবে নিতে হবে যাতে প্রয়োজনে তা পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা সম্ভব হয়।

১০. আবেগ ও মানসিক চাপ ঃ অধিকাংশ সিদ্ধান্ত পরিস্থিতির সঙ্গে ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা জড়িত থাকে। যা থেকে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারীর মনে ভীতি বা উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় আবেগ বা মানসিক চাপ বেড়ে গেলে স্বাভাবিক কার্যধারা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এ কারণে সিদ্ধান্তের ওপর আবেগ ও মানসিক চাপের প্রভাব কিরূপ হবে পূর্ব থেকেই তা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

উপরোক্ত উপাদানগুলো ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে এসব বিষয়কে বিশেষভাবে বিবেচনায় আনতে হবে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পদক্ষেপ

সিদ্ধান্তগ্রহণ ব্যবস্থাপনার মুখ্য কাজ। কার্যপরিবেশের ক্রমবর্ধমান জটিলতা, গতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাফল্যের ওপরই ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক সাফল্য নির্ভর করে। এ কারণেই সিদ্ধান্ত গ্রহণকে একটি যৌক্তিক মডেল হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজন পড়ে। এই মডেলের সাথে কতকগুলো ধারাবাহিক পদক্ষেপ জড়িত। নিম্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার পদক্ষেপগুলো উল্লেখ করা হলো ঃ

সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় উল্লিখিত ধারাবাহিক পদক্ষেপগুলো নিম্নের মডেলে উপস্থাপন করা হলো ঃ

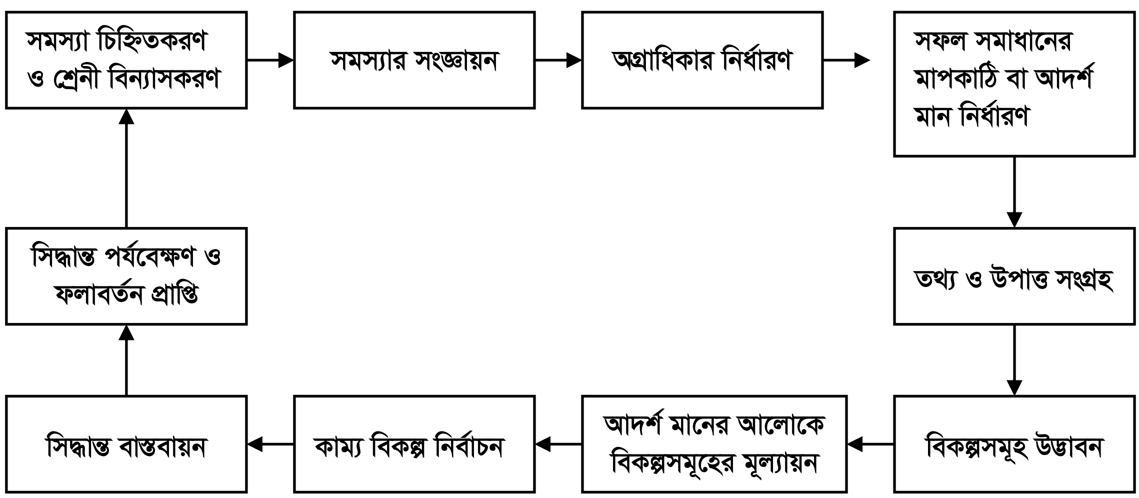

চিত্র ঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া মডেল

মডেলে উল্লেখিত পদক্ষেপসমূহ নিম্নে আলোচিত হলো ঃ

১. সমস্যার চিহ্নিতকরণ ও শ্রেণীবিন্যাসকরণ*(Identifying and classifying problem)*ঃ প্রতিষ্ঠানে সমস্যার সমাধানের জন্যই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাই প্রথমেই প্রতিষ্ঠানের সমস্যা চিহ্নিত করতে হয়। সমস্যাদির প্রকৃতি অনুযায়ী সেগুলোকে শ্রেণীভূক্ত করতে হয়। সমস্যাগুলোকে পৌনঃপুনিক *(Recurring)*, নৈমিত্তিক *(Routine)* এবং একক ও অনৈমিত্তিক *(Unique)* এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে।

২. সমস্যার সংজ্ঞায়ন*(Defining the problem)*ঃ সমস্যার শ্রেণীবিন্যাসের পর সমস্যাকে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশের অর্থই সমস্যার সংজ্ঞায়ন। অর্থাৎ সমস্যার প্রকৃতি, কারণ ও ফলাফল সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করতে হয়। সমস্যার সংজ্ঞায়নের ফলে সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় এবং কোন সমস্যাটি সমাধানের জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন তা জানা যায়।

৩. অগ্রাধিকার নির্ধারণ*(Determining priority)*ঃ সমস্যার শ্রেণীবিন্যাস ও সংজ্ঞায়নের পর ব্যবস্থাপকগণ সমস্যাগুলোকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সাজান। সমস্যার অগ্রাধিকার নির্ধারণে সাধারণত নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয় ঃ

ক. সমস্যার ফলাফল
খ. সংগঠনে সমস্যার প্রভাব
গ. সময়ের দাবি এবং জরুরী প্রয়োজন
ঘ. ব্যবস্থাপকের নৈপুণ্য ও সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার
ঙ. সমস্যার আকর্ষণীয়তা ও
চ. সমস্যার জীবনকালের বিস্তার।

৪. সফল সমাধানের মাপকাঠি বা আদর্শমান নির্ধারণ*(Determining the standard for proper solution)* ঃ কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাপক কী অর্জন করতে চাচ্ছেন বা কিরূপ ফলাফল প্রত্যাশা করছেন তা নির্দিষ্ট করা হয়। মাপকাঠি সুস্পষ্টকরণের উদ্দেশ্য হলো একটি আদর্শমান নির্দিষ্ট করা যার সঙ্গে বিকল্পগুলোকে তুলনা করা যাবে। সাধারণত নিম্নোক্ত দু'ধরনের মাপকাঠি বা আদর্শমান নির্ধারণ করতে হয়।

ক. আবশ্যকীয় মাপকাঠি ঃ মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত পরিমাপক যেগুলো কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আবশ্যকীয়ভাবে পূরণ করতে হয়;

খ. কাম্য মাপকাঠি ঃ সিদ্ধান্ত ও কার্যধারা গ্রহণে যেসব মাপকাঠি বা আদর্শমান আবশ্যক না হলেও আকাঙ্খিত এবং যেগুলো বিকল্প কার্যধারা সিদ্ধান্তের অন্তর্নিহিত মূল্য বা গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

৫. তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ*(Collecting data and information)* ঃ প্রাসঙ্গিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য ও উপাত্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আবশ্যক। কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত সকল তথ্য সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত হতে হয়। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নির্ধারিত সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা আবশ্যক।

৬. বিকল্পসমূহ উদ্ভাবন*(Generating alternatives)*ঃ এ পর্যায়ে সমস্যা সমাধানের মাপকাঠি বা আদর্শমান নির্ধারণ করার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে সমস্যা সমাধানের কতিপয় বিকল্প উপায় উদ্ভাবন করতে হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও সিদ্ধান্ত পরিস্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সৃজনশীলতা, বুদ্ধিমত্তা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে সম্ভাব্য সমস্যা সমাধানের পন্থাগুলো চিহ্নিত করেন। ব্যবস্থাপকগণকে এক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় অধিকতর সৃজনশীলতার পরিচয় দিতে হয়।

৭. বিকল্পসমূহের মূল্যায়ন *(Evaluating alternative)* ঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী অনেকগুলো সম্ভাব্য সমাধানের পন্থা চিহ্নিত করার পর প্রত্যেকটি বিকল্প পন্থাকে পূর্ব নির্ধারিত আদর্শমান বা মাপকাঠির আলোকে মূল্যায়ন করতে হয়। বিকল্পসমূহ মূল্যায়নে কতগুলো কৌশল প্রয়োগ করা হয়।

৮. কাম্য বিকল্প নির্বাচন*(Choosing an optimum alternative)* ঃ মূল্যায়নকৃত বিকল্প কার্যধারা থেকে সর্বোত্তম বিকল্পটি গ্রহণই মূলত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রকৃত কাজ। এ পর্যায়ে সিদ্ধান্তকারী একটি বিকল্প পন্থা নির্বাচন করেন এবং অপরাপর সবগুলো বর্জন করেন।

৯. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন*(Implementing the decision)*ঃ সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর তা বাস্তবায়ন করাও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর কাজ। বস্তুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের এ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ, প্রয়োজনীয় দায়িত্ব ও কার্যভার অর্পণ ও কার্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন পড়ে। বাস্তবায়নের পথে সম্ভাব্য সকল প্রতিবন্ধকতা এবং দ্বন্দ্ব পূর্ব থেকেই চিহ্নিত করতে হয় এবং সে সবের মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হয়।

১০. সিদ্ধান্ত পর্যবেক্ষণ ও ফলাবর্তন*(Monitoring the decision and getting feedback)* ঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার শেষ ধাপটি হলো সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা এবং বাস্তবায়ন কাজে কোন ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি হচ্ছে কিনা তা দেখে সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া। মনিটরিং বা পর্যবেক্ষন ব্যবস্থা কার্যকর থাকলে সমস্যা উদ্ভবের পূর্বেই তা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণে নার্সিং পেশার চ্যালেঞ্জসমূহ

বহু যুগ ধরেই নার্সগণ একজন রুগীর বহুমাত্রিক চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদানে নিয়োজিত আছেন। তাদের নেতৃত্ব দানের দক্ষতা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। প্রতিটি পর্যায়ে নিয়োজিত নার্সদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সংস্থার সকল ধরণের কার্যাবলী ও তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান / ধারণা থাকা প্রয়োজন। যেহেতু নার্সদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন থেকে আসে, সেহেতু তা রুগীদেরকে যেভাবেই হউক না কেন প্রভাবিত করে। যে ধরণের সিদ্ধান্তসমূহ নার্সদের জন্য প্রযোজ্য, সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদেরকে সরাসরি সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

অধ্যায় দুইঃ অন্যদের পরিচালনা করা ও একসাথে কাজ করা (Managing and working with others)

অধিবেশন ২.১ ঃ **টীম / দল গঠন (Team Building)**

অধিবেশন ২.২ ঃ **কমিটি পর্ষদ (Committee)**

অধিবেশন ২.৩ ঃ **অভিযোগ পরিচালনা (Grievance Handling Procedure)**

অধিবেশন ২.৪ ঃ **শৃঙ্খলা বিধান(Disciplinary Actions)**

হ্যান্ডআউট ২.১ঃ দল গঠন(Team Building)

ধারণা

দল বলতে বুঝায় এমন কোন ব্যক্তিবর্গ যারা অবশ্যই একে অপরের সাথে অভিন্ন উদ্দেশ্য অর্জনে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। দল গঠণ হচ্ছে একটি পরিকল্পিত এবং কার্যকর কর্মপদ্ধতি যা কাজের অন্তরায় দূর করে দলের ক্ষমতা এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

দল নানা ধরনের। দলের বৈশিষ্ট্য এবং সাধারণভাবে এর কাজ, উদ্দেশ্য এবং অবস্থার উপর ভিত্তি করেই নেতা / ব্যবস্থাপকের নিকট দলীয় প্রত্যাশা নির্ভর করে।

যদিও সকল দলই ব্যক্তির সমষ্টি যারা একে অপরকে সাহায্য করার মাধ্যমে সাধারণ লক্ষ্য অর্জন করেন তথাপি দলীয় কার্যক্রমের ভিন্নতা আছে। একইভাবে, সকল দলই একই সংখ্যক সদস্য দ্বারা গঠিত হয় না। তাই দল গঠনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপক সকল ইস্যুকে সামনে রেখে কৌশল অবলম্বন করবেন।

দল গঠন কেন প্রয়োজন?

যখন বাস্তবতার নিরীখে দেখা যায় একক প্রচেষ্টায় সাংগঠনিক লক্ষ্য অর্জন নানা প্রতিবন্ধকতার আলোকে সম্ভব হয় নাতখন দল গঠণ করতে হয় এ অবস্থায় কেউ এর থেকে পরিত্রান চান, কেউ বা পরিবর্তন চান।

দল গঠনের পূর্ব সমস্যাসমূহ বা উপসর্গসমূহ নানা রকমের। যেমন ঃ দলীয় নেতা ও দলীয় সদস্যদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি এবং দলীয় সদস্যদের মধ্যে বিদ্যমান অসুবিধা। এর প্রতিফলন ঘটে নানাভাবে ঃ অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ, দ্বন্দ্ব, সংশয়, অকার্যকর সভা, অনাগ্রহ ইত্যাদি।

দলীয় নেতাগন যখন অন্য সদস্যদের প্রতি অসহনশীল হন, আক্রমনাত্মক হন, বিশ্বাস ভঙ্গ করেন, অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেন তখন তিনি ব্যর্থ হন। এমতাবস্থায়, দল গঠনের মাধ্যমে সাংগঠনিক কর্মকান্ডের সামাজিক দিককে পূর্ণ জীবন প্রদান ও উন্নয়ন সাধন করা হয়।

দল গঠনের প্রারম্ভেই স্থির করতে হবে কোন লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে, যা দলগতভাবে মোকবেলা করা সম্ভব। তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ, এর নিরীক্ষা এবং এ্যাকশন প্লান তৈরী করা। এতে দলীয় সদস্যগণ মানসিক এবং তথ্যগতভাবে পূর্ব প্রস্তুতি নিতে পারবেন।

একটি উচ্চ মাত্রার কার্যকরী দলের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

- অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব ঃ ক্ষমতায়নের মাধ্যমে পারস্পরিক নির্ভরতা সৃষ্টি
- যৌথ দায়িত্ব ঃ এমন একটি পরিবেশ তৈরী করা যেখানে দলের সকল সদস্য দলীয় কার্যকরী কর্মসম্পাদনের জন্য যার যার দায়িত্ব পালন করে।
- উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত ঃ দল দলীয় কার্যাবলীর ব্যাপারে একটি অভিন্ন উদ্দেশ্য পোষন করে।
- কার্যকর যোগাযোগ ঃ এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা যা বিশ্বস্ত ও খোলামেলা যোগাযোগ সৃষ্টির সহায়ক।
- ভবিষ্যৎমুখী ঃ পরিবর্তনকে সমৃদ্ধির সুযোগ হিসাবে দেখা।
- কাজকেন্দ্রীক ঃ কাজের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে।
- সৃষ্টিশীল প্রতিভা ঃ কর্মীর প্রতিভা এবং সৃষ্টিশীলতার প্রয়োগ।
- দ্রুত সাড়া দেয়া ঃ সুযোগ চিহ্নিতকরণ এবং একে কাজে লাগানো।

দল গঠনের স্তরসমূহ ঃ

১। **গঠন ঃ** যখন কার্যক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে দল গঠন করা হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সদস্যগণকে একত্রে দলীয়কার্যে উৎসাহ দেয়া হয় তখন তাকে দলের গঠন স্তর বলে। এই স্তরে সদস্যগণ দলের মধ্যে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে সচেষ্ট হয় এবং অন্যদের নিকট নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন হয়। এই স্তরে সদস্যগণ আন্তঃক্রিয়া সম্পাদনে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে এবং তাদের মধ্য পারস্পারিক সম্পর্ক নিবিড় হয় না। দলের যে কোন সিদ্ধান্ত সাধারণতঃ বাকপটু সদস্যগণ কর্তৃক গৃহীত হয়ে থাকে। এই স্তরে দলের অন্যান্য সদস্যগণ সচরাচর নিজেদের মতামত ও অনুভূতি প্রকাশ করে না।

২। **বিভ্রান্তি ঃ** আনুষ্ঠানিক দল সৃষ্টির কিছুকাল পর দলের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক উপদল তৈরী হয়। দলের নূতনত্বের কারণে প্রাথমিকভাবে দলের সদস্যদের মধ্যে খুবই সীমিত আকারে পারস্পরিক মতামত বিনিময় হয়। তবে এই স্তরে দুই-তিন জনের ছোট দলের সদস্যগণ পরস্পরের সাথে পরিচিত হবার জন্য তাৎক্ষণিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। এইভাবে এই স্তরে উপদল গঠিত হয়। উপদল গঠন প্রক্রিয়া চলাকালীন সদস্যগণ দলের মধ্যে থেকেও পূর্বের স্তরের তুলনায় বেশি অস্বস্তিবোধ করে এবং বৃহত্তর দলে নিজেদের অবস্থান ও ক্ষমতা যাচাইয়ে সচেষ্ট হয়।

৩। **নিয়ম-কানুন তৈরী ঃ** বিভ্রান্তি স্তরে সদস্যগণের মধ্যে বিদ্যমান মতবিরোধ, অর্ন্তদ্বন্দ্ব এবং ক্ষমতার লড়াইয়ের মনোভাব এই স্তরে সুষ্ঠুভাবে সামাধানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। এই স্তরে দলীয় আদর্শের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। সদস্যগণ দলের লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন হয়, নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ নিরসনে সচেষ্ট হয় এবং দলকে কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই স্তরের সদস্যগণ সন্তুষ্টি লাভ করে এবং পরস্পরের প্রতি আস্থার মনোভাব গড়ে ওঠে।

৪। **সম্পাদন ঃ** দলের সদস্যগণের মধ্যে সহযোগিতার মাত্রা যখন সর্বোচ্চ হয় তখনই দল উন্নয়নের সর্বশেষ পর্যায় পরিলক্ষিত হয়। এই স্তরে দল সামগ্রিক পরিপূর্ণতা লাভ করে। দলের সদস্যগণ দলের লক্ষ্যের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়, পারস্পরিক আস্থার ভাব সৃষ্টি হয়, প্রত্যেকেই খোলাখুলিভাবে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করে এবং যে কোন সমস্যা বা মতবিরোধের সন্তোষজনক সমাধানের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালায়। এই স্তরে প্রত্যেকেই অভয়হীন মনে মতামত ব্যক্ত করে এবং দলীয় সদস্যদের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের ওপর গুরত্ব আরোপ করা হয়। সদস্যদের কার্যদক্ষতার মাত্রা, কার্য সন্তুষ্টির মাত্রা এবং দলের প্রতি অঙ্গীকারের মাত্রা ইত্যাদি সকল বিষয়ই এই স্তরে সর্বোচ্চ হয়ে থাকে।

দলের সদস্যদের পালনীয় নিয়মসমূহ ঃ

১. সঠিক সময়ে উপস্থিতি
২. প্রস্তুতি গ্রহণ - যেমন হোম ওয়ার্ক করা
৩. দলীয় প্রয়োজনে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকা
৪. মনোযোগ দিয়ে অন্যের কথা শোনা
৫. মূল বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা
৬. নিজের যথার্থ অংশীদারিত্ব পালন করা এবং অপরকেও সহায়তা করা
৭. নেতিবাচক না হওয়া এবং সবকিছুর ভালো দিককে গুরুত্ব দেয়া
৮. শৃংখলাবোধের বিভিন্ন পর্যায়কে অনুধাবন করা
৯. মতানৈক্যকে মেনে নিয়েই সমাধানের চেষ্ট করা
১০. আত্মরক্ষামূলক মনোভাব থাকলে প্রশ্ন করে বুঝে নেয়া
১১. দায়িত্বশীলতা প্রতিষ্ঠা করা
১২. নিজের ও দলের জবাবদিহিতাকে প্রতিষ্ঠা করা
১৩. পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকল সদস্যের সাথে সমরূপ আচরণ করা
১৪. সফলতা ও ব্যর্থতার দায়ভার সমানভাবে বহন করা
১৫. এক অপরকে উৎসাহিত ও সহযোগীতা করা
১৬. দলীয় সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা।

দলীয় কাজের পূর্ব শর্তসমূহঃ

১. পরিষ্কার মিশন/স্বচ্ছ এবং অভিন্ন উদ্দেশ্য
২. সুন্দর/খোলামেলা পরিবেশ
৩. আলোচনা করার সুযোগ/মুখোমুখি কথা বলা
৪. বিশ্বাস ও স্বচ্ছতা
৫. মত বিরোধ/দ্বন্দ্ব হবে, তবে তা নিরসন হবে
৬. ভালো সমালোচনা গ্রহণ করার ক্ষমতা
৭. একমতে উপস্থিত হবার মত অবস্থা
৮. ভালো এবং কার্যকরী নেতার উপস্থিতি
৯. সমর্থন ও বিশ্বাস

১০. সহযোগীতা
১১. সুষ্ঠু পদ্ধতি
১২. সঠিক নেতৃত্ব
১৩. নিয়মিত পর্যালোচনা
১৪. ব্যক্তিগত উন্নয়ন/দলের সকলের উন্নয়ন
১৫. সুষ্ঠু আন্তঃদলীয় সম্পর্ক
১৬. সকলের সমান অংশগ্রহণ
১৭. সুষ্ঠু পরিকল্পনা
১৮. পরিকল্পনা সঠিক সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করা
১৯. সমস্যা সমাধানে প্রাধান্য দেয়া
২০. মিটিং ডাকলে তার এজেন্ডা সবাই জানবে
২১. দ্বন্দ্ব নিরসনে জোড় দেয়া
২২. প্রত্যেকে প্রত্যেককে সমর্থন করা
২৩. দ্বন্দ্ব এর খোলামেলা আলোচনা
২৪. সদস্যরা একে অপরের সান্নিধ্য পছন্দ করে
২৫. নেতা ও দলের সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন

হ্যান্ডআউট ২.২ঃ কমিটি বা পর্ষদ (Committee)

সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানেই কমিটির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ অর্থে কমিটি হলো কতিপয় লোকের সমষ্টি যাদের ওপর প্রশাসনিক বিশেষ কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ব্যাপক অর্থে কমিটি হলো কতিপয় ব্যক্তির সমষ্টি যাদের ওপর বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে প্রশাসনিক দায়িত্ব বা কোনো কার্যভার অর্পণ করা হয় এবং যারা সামষ্টিকভাবে সেই দায়িত্ব পালন বা কার্য সম্পাদন করে। কমিটি সংগঠনকে কমিশন, কাউন্সিল, টাস্কফোর্স ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়।

কমিটি বা পর্ষদ সংগঠন হলো একদল লোকের সমষ্টি যারা কোনো কাজ সম্পাদন বা দায়িত্ব পালনের জন্য সাংগঠনিক নিয়মে বা উর্ধ্বতন কর্তৃক নির্বাচিত বা নিয়োজিত হয়ে এবং বিভিন্ন সময়ে মিলিত হয়ে আলোচনার ভিত্তিতে বা সম্মিলিত চেষ্টায় যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করে। কমিটি স্থায়ী বা অস্থায়ী প্রকৃতির হতে পারে। একটি কোম্পানীতে বোর্ড অব ডিরেক্টরস স্থায়ী কমিটির উদাহরন। এভাবে এক্সিকিউটিভ কমিটি, ফিন্যান্স কমিটি ইত্যাদি স্থায়ী কমিটি। আবার পর্যালোচনা কমিটি, খসড়া প্রণয়ন কমিটি ইত্যাদি অস্থায়ী ধরনের কমিটি।

কমিটির প্রকারভেদ

(ক) স্থায়ীত্বের দৃষ্টিকোন থেকে শ্রেণীবিভাগ

১. স্থায়ী কমিটি(*Standing Committee*)ঃপ্রাতিষ্ঠানিক নিয়মে, সাংগঠনিক বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে যে কমিটি দীর্ঘমেয়াদে কোন প্রশাসনিক কাজ সম্পাদনের নিমিত্তে গঠিত হয় তাকে স্থায়ী কমিটি বলে। অর্থাৎ স্থায়ী কমিটি হলো এমন একটি কমিটি যা স্থায়ী প্রকৃতির। অর্থ বা কর্মী বিষয়ক কমিটি যা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে থাকে তা এ ধরনের। প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মী বিষয়ক কমিটি দীর্ঘমেয়াদে শ্রমিক কর্মীদের নানা ধরনের অভাব-অভিযোগ নিষ্পত্তি, পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা, আর্থিক ও অনার্থিক সুযোগ-সুবিধা দেখাশুনা ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে। এরূপ কমিটির সদস্য নির্দিষ্ট সময় শেষে বা পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত বা আবর্তিত হতে পারে কিন্তু কমিটি দীর্ঘমেয়াদে কাজ করে। এভাবে প্রতিষ্ঠানে নির্বাহী কমিটি, পরিচালনা বোর্ড, অর্থ কমিটি ইত্যাদি এর উদাহরণ।

২. অস্থায়ী কমিটি (*Adhoc Committee or Temporary Committee*)ঃ কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জন বা কাজ সম্পাদনের জন্য সাময়িক প্রকৃতির যে কমিটি গঠন করা হয় তাকে অস্থায়ী কমিটি বলে। অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যার্জনের নিমিত্তে গঠিত কমিটি হলো অস্থায়ী কমিটি যা ঐ কাঙ্খিত উদ্দেশ্যার্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এ কমিটি প্রয়োজনমতো উর্ধ্বতন নির্বাহী কর্তৃক গঠন করা হয় এবং এর সদস্য কারা হবে তাও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করে। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে তদন্ত কমিটি, সুপারিশ কমিটি, বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ক্রয় কমিটি, পুরাতন সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় কমিটি ইত্যাদি এর উদাহরন। অর্থাৎ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে গেলেই এ কমিটির বিলুপ্তি ঘটে।

৩. **মেয়াদী কমিটি (*Committee for Fixed Time*)ঃ**নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কোন প্রশাসনিক বা অন্য কোনো কাজ সম্পাদনের জন্য কোনো কমিটি গঠন করা হলে তাকে মেয়াদী কমিটি বলে। অবস্থাভেদে মেয়াদী কমিটিকে স্থায়ী কমিটি হিসেবেও গণ্য করা যায়। একটি কলেজের গভর্নিং বডি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য গঠিত হয়। উক্ত সময় শেষে কমিটি বিলুপ্ত হলেও পুনরায় নতুন কমিটি গঠিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রশাসনিক নিয়মেই সেখানে কমিটি কাজ করে। একটি কমিটি গঠিত হওয়ার পর তা একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বহাল থাকে বিধায় একে মেয়াদী কমিটি হিসেবে গণ্য করা যায়। আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির অধিকাংশই এ ধরণের মেয়াদী কমিটি।

(খ) আনুষ্ঠানিকতার দৃষ্টিকোন থেকে শ্রেণীবিভাগ

১. **আনুষ্ঠানিক কমিটি(*Formal Committee*)ঃ**প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মে বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে নির্দিষ্ট দায় ও কর্তৃত্ব সহযোগে যে কমিটি গঠিত হয় তাকে আনুষ্ঠানিক কমিটি বলে। কমিটি বলতে মূলত আনুষ্ঠানিক কমিটিকেই বুঝায়। অর্থাৎ সংগঠন কাঠামোর অংশ হিসেবে যদি কোন কমিটি গঠিত হয় এবং সুনির্দিষ্ট রূপে দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব প্রদান করা হয় তবে তাকে আনুষ্ঠানিক কমিটি বলে। কমিটি স্থায়ী বা অস্থায়ী যে ধরনেরই হোক না কেন তাকে আনুষ্ঠানিক কমিটি বলা হয়। এক্ষেত্রে কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য, সদস্য সংখ্যা, কমিটির সদস্যদের কাজ, দায়-দায়িত্ব, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ইত্যাদি পূর্বেই নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়।

২. **অনানুষ্ঠানিক কমিটি (*Informal Committee*)ঃ**পূর্ব থেকে কোন কমিটি ঘোষণা না করা থাকলেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যদি কোন বিশেষ বিষয়ে পরামর্শ নেওয়ার জন্য বা আলাপ-আলোচনা করার জন্য অধঃস্তন নির্বাহীদের বা প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের ভিতরের-বাইরের অন্যদের নিয়ে এক বা একাধিক অধিবেশনে মিলিত হন তবে তাকে অনানুষ্ঠানিক কমিটি বলে। এ ধরনের কমিটি মূলত পরামর্শমূলক বা উপদেষ্টামূলক কাজেই ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার জন্য বা সুপারিশ করার জন্য বা অনানুষ্ঠানিকভাবে কোন বিষয়ের মতামত তৈরী, পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি কাজে উর্ধ্বতন অধস্তনের ওপর দায়িত্ব অর্পন করতে পারেন। একাধিক ব্যক্তির ওপর একযোগে এরূপ দায়িত্ব অর্পণ করায় এবং তারা একত্রে এ কাজ করায় তা কার্যত কমিটির রূপ লাভ করে। অর্থাৎ কোন সুনির্দিষ্ট সমস্যার ওপর দলীয় চিন্তা-চেতনা বা দলীয় সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য কতিপয় ব্যক্তির মাঝে কোন প্রকার কর্তৃত্বার্পূন ব্যতীত যে কমিটি গড়ে ওঠে তাকে অনানুষ্ঠানিক কমিটি বলে।

(গ) কর্তৃত্বের দৃষ্টিকোন থেকে শ্রেণীবিভাগ

১. **বিষয়ভিত্তিক কমিটি(*Line Committee*)ঃ**বিষয়ভিত্তিক কমিটি বলতে সরলরৈখিক কর্তৃত্বসহযোগে গড়া কমিটিকে বুঝায়। এরূপ কমিটি অর্পিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে পারে। উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি বলতে মূলত বিষয়ভিত্তিক কমিটিকেই বুঝায়। একে নির্বাহী কমিটি নামেও অভিহিত করা হয়। বহুসংখ্যক নির্বাহী কমিটি বলতে যা বুঝায় তা বিষয়ভিত্তিক কমিটি হিসেবে গণ্য। এতে একাধিক নির্বাহী থাকে এবং তারা ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলী সম্পাদন করে। এমন ধরনের কমিটিতে সাধারণত প্রতিষ্ঠানের উচ্চ নির্বাহীগণ বা মালিক পক্ষের প্রতিনিধিগণ অন্তর্ভুক্ত থাকেন। প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহী কমিটি, কোম্পানীর পরিচালকমন্ডলী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি এর উদাহরণ।

২. উপদেষ্টা কমিটি বা বিশেষজ্ঞ কমিটি(*Advisory or Technical Committee*)ঃশীর্ষ নির্বাহীকে প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরামর্শ বা উপদেশ প্রদানের লক্ষ্যে যে কমিটি গঠন করা হয় তাকে উপদেষ্টা কমিটি বলে। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শীর্ষ নির্বাহী বা নির্বাহী কমিটিকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির কাজ হয় প্রয়োজনীয় বিষয়ে বা উত্থাপিত শীর্ষ নির্বাহীকে উপদেশ বা পরামর্শ দেওয়া। এরূপ উপদেশ মানতে অবশ্য শীর্ষ নির্বাহী বাধ্য নয়, তবে এক ধরনের পরামর্শ তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে যথেষ্ট সহায়তা করে। কিছু যোগ্যতাসম্পন্ন, সামর্থবান ও প্রতিষ্ঠানের ভালো চায় এমন ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে রাখার স্বার্থে ও বিশেষ কোন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। প্রতিষ্ঠানে বড় ধরনের একটা নতুন মেশিন বসানোর ক্ষেত্রে যন্ত্র প্রকৌশলীদের নিয়ে একটা বিশেষজ্ঞ বা কারিগরি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। শিক্ষা বোর্ড কারিকুলাম তৈরী করতে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য অনেক সময় বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে।

৩. সহযোগী কমিটি(*Associate Committee*)ঃশীর্ষ নির্বাহীদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা দানের জন্য যে কমিটি গঠন করা হয় তাকে সহযোগী কমিটি বলে। এরূপ কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতো কোন বিশেষ কর্তৃত্ব থাকে না । তবে উর্ধ্বতন কর্তৃক যে কাজে দায়িত্ব অর্পণ করা হয় সেই বিষয়ে কমিটি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে। কোন চুক্তির বা প্রস্তাবনার খসড়া প্রণয়ন কমিটি, হিসাব নিরীক্ষণ কমিটি, সমন্বয় কমিটি, তদন্ত কমিটি, তথ্য সংগ্রাহক কমিটি, তত্ত্বাবধান কমিটি ইত্যাদি এরূপ কমিটির উদাহরণ। ক্ষেত্রবিশেষে এরূপ কমিটি কিছুটা কর্তৃত্ব ভোগ করে।

কমিটির প্রয়োজনীয়তা এবং এর ব্যাপক ব্যবহারের কারণ
(Extensive use of Committee)

বর্তমানে যে কোন ধরনের বড় প্রতিষ্ঠানে কমিটি একটি অতি পরিচিত নাম ও বহুল ব্যবহৃত বিষয়। অনেকেই অনেকভাবে কমিটিকে সমালোচনা করলেও দিন দিন বিভিন্ন ক্ষেত্রে কমিটির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতেই এর প্রয়োজন ও উপযোগীতার বিষয়টি ধরা পড়ে। নিম্নে যে সকল কারণে কমিটির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয় তা তুলে ধরা হলো ঃ

১. দলবদ্ধ বিবেচনার সুযোগ(*Opportunity of Group Judgment*)ঃ একক ব্যক্তি কোনো বিষয়ে যখন সিদ্ধান্ত নেয় তখন ব্যক্তিক চিন্তা, তথ্য, দৃষ্টিভঙ্গি ও বিবেচনা শক্তির সীমাবদ্ধতার কারণে সেখানে কিছুটা ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু যখন একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে কোন কমিটি ঐ বিষয়ে একত্রে চিন্তা-ভাবনা করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই সকলের সম্মিলিত চিন্তা, তথ্য, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি যোগ হওয়ায় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ ও সম্ভব হয়।

২. সমন্বয় সাধনে সহায়তা(*Assisting coordination*)ঃ বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগের কাজকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যপানে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর দায়িত্ব সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন নির্বাহীগণ পালন করেন। কিন্তু তাদের কাজের চাপ অনেক সময়ই বেশী থাকে। এছাড়া সমন্বয়ের বিষয়টি কোন নির্দেশ দান বা চাপ সৃষ্টির বিষয় নয় বিধায় এক্ষেত্রে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা অপরিহার্য বিবেচিত হয়।

৩. স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের প্রতিনিধিত্ব(*Representation of interested group*)ঃ প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মে নির্বাহী কর্তৃক একক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাধারণ নিয়ম অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকর বিবেচিত হয় না। ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন পক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নীতি নির্ধারন ও আলাপ-আলোচনা করলে তা অনেক বেশি প্রতিনিধিত্বশীল ও ফলদায়ক হয়। কমিটিতে যেহেতু বিভিন্ন পক্ষের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভূক্ত করা যায় তাই এতে গৃহীত সিদ্ধান্তে সকল স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়। ফলে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সহজ হয়।

৪. তথ্য ও ভাবের বিনিময়(*Interchanging ideas and information*)ঃ তথ্য ও ভাবের বিনিময়ের ক্ষেত্রেও কমিটি অত্যন্ত কার্যকর সহযোগিতা প্রদান করে। কমিটির সভায় সমবেত সদস্যগণ তাদের বিভাগীয় তথ্য, অবস্থা, সুবিধা-অসুবিধা তুলে ধরে তা অন্যের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে পারে।

৫. সহযোগীতার উন্নয়ন(*Promotion of cooperation*)ঃ প্রতিষ্ঠানে দলবদ্ধ প্রচেষ্টা জোরদারের ক্ষেত্রে সহযোগিতার উন্নয়ন অপরিহার্য। এক্ষেত্রে ওপর হতে নিচ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ে চিন্তার ঐক্য ও দলীয় সমঝোতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। অথচ প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্ব সাধারণত প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কতিপয় ব্যক্তির হাতে থাকে। এতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও বাস্তবায়নকারী পক্ষের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে উর্ধ্বতন ও অধঃস্তনদের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটি যখন কাজ করে তখন সেখানে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে উর্ধ্বতন যেমনি নিচের দিকের বাস্তব অবস্থা ও সমস্যা বুঝতে পারে তেমনি অধঃস্তন নির্বাহীগণও উর্ধ্বতনদের চাওয়া-পাওয়া ও বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পায়। এতে ওপর ও নীচের সহযোগিতার উন্নয়ন ঘটে।

৬. গণতান্ত্রিক মনোভাবের বিকাশ(*Development of democratic attitude*)ঃ কমিটি প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতনদের মাঝে গণতান্ত্রিক মনোভাবের বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কমিটিতে যারা সদস্য হন সবাই সেখানে সমান অধিকার ভোগ করেন।

৭. একক কর্তৃত্বের ভীতি হ্রাস(*Lessening the fear of single authority*)ঃ একক কর্তৃত্ব অনেক সময়ই উর্ধ্বতনকে স্বৈরাচারী করে। কোনো প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন যদি এভাবে স্বেচ্ছাচারী হয় তবে সেখানের উন্নয়ন কার্যত সম্ভব হয় না। উর্ধ্বতন যাতে এভাবে একক কর্তৃত্বের কারণে স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়তে না পারে সেজন্য প্রতিষ্ঠানে কিছু কিছু কর্তৃত্ব বিভিন্ন কমিটির ওপর অর্পন করে ক্ষমতার কেন্দ্রে ভারসাম্য স্থাপন করা হয়।

৮. প্রনোদনা সৃষ্টি(*Creating inspiration*)ঃ কমিটির সদস্যপদ ব্যক্তির মাঝে প্রণোদনা বা অনুপ্রেরণা সৃষ্টিতেও গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখে। এ ক্ষেত্রে কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করে। সেখানে কমিটি সকল পক্ষের সন্তুষ্টিরও কারণ হয়।

৯. সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও চিন্তাধারার বিকাশ(*Providing training for members and improving their thinking*)ঃ কমিটি প্রশিক্ষণ দানের একটি অন্যতম উপায় হিসেবে বর্তমানকালে বিবেচিত। কমিটিতে জুনিয়র যে সকল সদস্য অন্তর্ভূক্ত হয় তারা কমিটির সভায় সিনিয়র সদস্য ও উর্ধ্বতনের সাহচর্য লাভের সুযোগ পায়। সিনিয়র সদস্যদের আচার-আচরণ ও কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তারা যেমনি অনেক কিছু শিখতে পারে তেমনি বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তারা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যা ও করণীয় সম্পর্কে জানতে পারে।

১০. ব্যক্তিগত দায় ও অবাঞ্ছিত সমস্যা এড়ানো(*Avoidance of personal liabilities & undesirable problems*)ঃ কমিটির আরেকটি বড় উপযোগীতা হলো এর মাধ্যমে উর্ধ্বতন ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায় এড়িয়ে যেতে পারে। একজন যোগ্য প্রশাসন স্বাধীনমতো কমিটি গঠন করে নিজ সিদ্ধান্তকে কমিটির সিদ্ধান্ত হিসেবে প্রয়োগ করতে পারেন। প্রতিষ্ঠানে অনেক সময় এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যেখানে দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না আবার সমস্যাটি এড়িয়ে যাওয়াও সম্ভব হয় না। সেখানে উর্ধ্বতন কমিটি গঠন করে সহজেই এ অবাঞ্ছিত অবস্থা এড়িয়ে যেতে পারেন।

উপরোক্ত সুবিধাগুলোর কারণে বর্তমানে বৃহদায়তন সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের কমিটি গঠন করা হয়ে থাকে।

হ্যান্ডআউট ২.৩ ঃ অভিযোগ পরিচালনা

(Grievance Handling Procedure)

অভিযোগ*(Grievance)*

অভিযোগ হলো ব্যবস্থাপনার গোচরে আনীত কার্য সম্পর্কিত নানাবিধ প্রতিবাদ বা আনুষ্ঠানিক আপত্তি। বেতন, কার্য ঘন্টা, কার্য শর্ত, চুক্তিভঙ্গ, অন্যায় আচরণ প্রভৃতি বিষয়ক কোন আপত্তি, অসন্তুষ্টি বা নালিশই অভিযোগ হিসেবে পরিগনিত।

আইএলও এর মতে, অভিযোগ হলো এক বা একাধিক কর্মী কর্তৃক মজুরি, ভাতা, কার্য শর্ত এবং চাকরি বা এর সাথে সম্পর্কিত যেমন ঃ ওভারটাইম, ছুটি, বদলি, জ্যেষ্ঠতা, চাকরিচ্যুতি ইত্যাদি বিষয়ে উথাপিত নালিশ।

উপরের সংজ্ঞায় অভিযোগের তিনটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় ঃ

প্রথমতঃ, এটি কর্মীদের এক প্রকার অসন্তুষ্টি যা-

(ক) হতে পারে কর্মচারী কর্তৃক ব্যক্ত বা অব্যক্ত;
(খ) হতে পারে লিখিত বা মৌখিক;
(গ) হতে পারে বৈধ বা অবৈধ, সত্য বা সম্পুর্ণ ভিত্তিহীন বা হাস্যকর এবং
(ঘ) প্রতিষ্ঠান বা প্রাতিষ্ঠানিক কার্য সম্পর্কে উথাপিত।

দ্বিতীয়তঃ, অভিযোগের ক্ষেত্রে কর্মীরা মনে করে যে, তাদের বিরুদ্ধে অবিচার করা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ, অভিযোগকে নালিশ আকারে উথাপন করে ব্যবস্থাপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়।

অভিযোগের ফলে কর্ম অসন্তুষ্টি দেখা দেয়। এর ফলে কার্য সম্পাদনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তাই ব্যবস্থাপকদের এ ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন আবশ্যক।

অভিযোগ পরিচালনা পদ্ধতির গুরুত্ব(*Importance of Grievance Handling Procedure*).

একটি প্রতিষ্ঠানের সামাজিক সংগঠন অত্যন্ত জটিল। কেননা মানুষ একটি জটিল প্রাণী। তাকে দেখতে যতটা জটিল মনে হয় তার থেকেও সে অনেক বেশী জটিল। কর্মক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান, কার্যশর্ত, কার্যপরিবেশ প্রভৃতি সম্বন্ধে কর্মীদের নানাবিধ অভিযোগ থাকতে পারে। এ সমস্ত অভিযোগ সঠিকভাবে মোকাবিলা করা না হলে কর্মীদের আবেগের ভারসাম্যহীনতা, দ্বন্দ্ব ও সংঘাতসহ বিভিন্ন প্রকার সমস্যার জন্ম দেয়। এ কারণে ব্যবস্থাপকদেরকে অভিযোগের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয় এবং এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হয়। ফলে সংগঠনের Human Machine নামক উপাদানটি সঠিকভাবে সংরক্ষিত হয়।

অভিযোগ পদ্ধতি সমস্যাবলী গুরুতর রূপ ধারণ করার পূর্বেই তা নিয়ন্ত্রণে আনতে সাহায্য করে। যদি সমস্যার প্রতি মনোযোগ না দেয়া হয় তাহলে তা আরও শক্তি সঞ্চার করে। এক সময় তা প্রতিষ্ঠানের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে।

প্রতিষ্ঠানের কৃতকার্যতার জন্য সুষ্ঠু যোগাযোগ আবশ্যক। অভিযোগ পদ্ধতি উর্ধ্ব ও নিম্নমুখী যোগাযোগের উন্নতি সাধন করে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কর্মীদের অনুভূতি ও মনোভাব সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন। তাছাড়া কোম্পানীর উপর কর্মীদের প্রতিক্রিয়া জানা সম্ভব হয়।

অভিযোগ কর্মীদের মানসিক চাপ, আবেগ, হতাশা ও অসন্তুষ্টি বহিঃপ্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে। এর ফলে কর্মীদের অভাব অভিযোগ ও সমস্যাবলী বুঝা যায়। পুঞ্জীভূত আবেগ কর্মীদের স্বাভাবিক বিচার বিশ্লেষণ শক্তি নিস্তেজ করে। মনোভাব প্রকাশ করতে পারলে কর্মীদের হাতাশা হ্রাস পায়। তাছাড়া এর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়কদের দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

সুষ্ঠু অভিযোগ পদ্ধতি তত্ত্বাবধায়কদের স্বেচ্ছাচারী আচরণের উপর বাদ সাধে। কারণ তারা জানে যে অসদাচরণের কথা কর্মকর্তারা এ পদ্ধতির মাধ্যমে জানতে পারবে। অভিযোগ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠানে কার্যপরিবেশ উন্নত করে এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

অভিযোগের কারণসমূহ (*Causes of employee grievance*)

একজন কর্মী যখন উপলব্ধি করে যে, তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে বা তার স্বার্থহানি ঘটেছে তখন তার মধ্যে কর্ম অসন্তুষ্টি দেখা যায়। ফলে কর্মী প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে। এর থেকে উৎপত্তি ঘটে অভিযোগের। সাধারণত ব্যবস্থাপনার নীতি ও পদ্ধতির অপপ্রয়োগ ও ভুল ব্যাখ্যার জন্যই অভিযোগের সৃষ্টি হয়। তবে বিভিন্ন গবেষণা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে অভিযোগের বিভিন্ন কারণের কথা উল্লেখ করা হয়। নিচে অভিযোগের কারণগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

১। ব্যবস্থাপনা নীতি ও পদ্ধতির অপপ্রয়োগ (Unifair Application of Management Policy and Procedure) ঃ ব্যবস্থাপকগণ কখনও কখনও নীতি ও পদ্ধতির অপপ্রয়োগ করে থাকে। ফলে কর্মীদের স্বার্থহানি ঘটতে পারে। এতে অভিযোগের সৃষ্টি হয়।

২। নীচু মনোবল ও নৈরাজ্য (Low Morale and Frustration) ঃ কোন কারণে কর্মীদের মনোবল নীচু হলে বা হতাশা দেখা দিলে সামান্য অজুহাত ও ভুলভ্রান্তিতেই প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাব দেখা দেয়। নীচু মনোবল সম্পন্ন কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ পরিলক্ষিত হয়। ফলে অভিযোগের পরিমাণ বেশী হয়ে থাকে।

৩। চুক্তির ভাষার অস্পষ্টতা (Unclear Contractual Language) ঃ অনেক সময় চুক্তির ভাষার অস্পষ্টতার কারণে ব্যবস্থাপক নিজ স্বার্থে চুক্তির ব্যাখ্যা করতে চায়। ফলশ্রুতিতে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দেয় এবং নানারূপ অভিযোগ উত্থাপিত হয়।

৪। আইনভঙ্গ করা (Violation of Law) ঃ ব্যবস্থাপকরা যদি চাকরির শর্ত সংক্রান্ত কোন আইন ভঙ্গ করে বা অপব্যবহার করে তখন কর্মীরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে। তারা প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে।

৫। দলীয় মতামতের অবমাননা (Violation of Opinion of the Group) ঃ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই শ্রমিক সংঘ বা ট্রেড ইউনিয়ন থাকে। কখনও কখনও ব্যবস্থাপনা বা নির্বাহীরা সংঘের মতামত বা অভিপ্রায়কে মূল্য না দিয়ে নিজস্ব মতামত জোর করে চাপিয়ে দিতে চায়। ফলশ্রুতিতে দলের সদস্যরা অপমানবোধ করে এবং তারা ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে।

৬। স্বাভাবিক কার্যপদ্ধতির অবমাননা (Violation of Normal Work Procedure) ঃ অনেক সময় দেখা যায়, কর্তৃপক্ষ অথবা কোন কর্মী কাজের স্বাভাবিক ও প্রচলিত নিয়ম পদ্ধতি ভঙ্গ করে। ফলে অন্যান্য কর্মীরা স্বচ্ছন্দে কাজ করতে না পেরে অভিযোগ উত্থাপন করে।

৭। তত্ত্বাবধায়ক বা সুপারভাইজার কর্তৃক অশোভন আচরণ (Unfair Treatment by the Supervisor) ঃ তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক কর্মীদের প্রতি অশোভন আচরণ কখনই কাম্য নয়। কারণ এতে কর্মীদের মানসিক বিপর্যয় ঘটে। তাই কর্মীরা তত্ত্বাবধায়ক বা সুপারভাইজারের সমস্ত অশোভন আচরণের জন্য অভিযোগ উত্থাপন করতে পারে।

৮। কর্ম অসন্তুষ্টি (Dissatisfaction of the Job) ঃ কর্ম অসন্তুষ্টি অভিযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। কর্মীরা যখন কর্মানুপাতিক মজুরী না পায়, কার্য পরিবেশকে অসন্তোষজনক মনে করে এবং চাকরিতে ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সম্ভাবনা দেখতে না পায় তখন তাদের মধ্যে কর্ম অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হয়। প্রতিষ্ঠানের নীতি যদি এ সমস্ত বিষয়ের সুষ্ঠু দিক নির্দেশনা না দিতে পারে তখনই কর্মীরা প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করতে পারে।

৯। শাস্তিমূলক ব্যবস্থার অসংগতি (Inconsistency in the Disciplinary Action) ঃ প্রতিষ্ঠানে যদি একই অভিযোগের কারণে ব্যক্তিবিশেষে শাস্তির পরিমাণ ও ধরনের ব্যতিক্রম ঘটে তাহলে কর্মীদের আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়। এতে প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়, সাথে সাথে অভিযোগের পরিমাণও বেড়ে যায়।

১০। ভ্রান্ত ধারণা (Faulty Perception) ঃ কোন বিষয়ে কর্মী বা ব্যবস্থাপকদের ভ্রান্ত ধারণার কারণে উভয় পক্ষই স্ব-স্ব স্বার্থে বিষয়টির ব্যাখ্যা করতে চায়। এতে কর্মীরা আশানুরূপ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে অভিযোগ আনয়ন করতে পারে।

১১। স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাবিধান মান ভঙ্গ (Violation of Health and Safety Standard) ঃ মানুষ মাত্রই স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও নিরাপত্তার সুবিধা চায়। শ্রমিক কর্মীরাও তার উর্ধ্বে নয়। তাই প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধিসমূহ মেনে চলতে হয়। প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধিবিধানসমূহ সঠিকভাবে পালিত না হলে কর্মীদের/শ্রমিকদের মাঝে অসন্তোষ দেখা দেয়। ফলশ্রুতিতে অভিযোগের সৃষ্টি হয়।

১২। অবিশ্বাস (Non-faith) ঃ তত্ত্বাবধায়ক ও অধঃস্তনদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। যে কোন কারণে উভয় পক্ষের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি হলে অভিযোগ দানা বাঁধতে থাকে।

১৩। প্রয়োজনীয় কর্মী/শ্রমিক সুযোগ সুবিধার অভাব (Inadequate Employee Services) ঃ প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার অভাব থাকলে কর্মীদের অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। এ অসন্তোষ অভিযোগ সৃষ্টি করে।

১৪। শ্রম ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক (Union Management Relations) ঃ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্রমিক সংঘ অনুমোদনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন বা সংঘ কর্মকর্তাদের অমর্যাদা প্রদর্শন কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। এটি অভিযোগের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়।

১৫। যৌথ দরকষাকষির চুক্তি ভঙ্গ (Violation of Contract) ঃ কোন কোন প্রতিষ্ঠান যৌথ দরকষাকষির চুক্তি পালনে অস্বীকৃতি জানায়। কোন কোন প্রতিষ্ঠান এ ধরনের চুক্তি পালনে গড়িমসি বা অহেতুক বিলম্ব করে। এতে শ্রমিক সংঘের সদস্যরা অসন্তুষ্ট হয়ে নির্বাহীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করতে পারে।

উপরের আলোচনা ছাড়া আরও কিছু কারণ যেমন ঃ মজুরী সমন্বয়, উৎসাহ বোনাস প্রদান, জ্যেষ্ঠতা নির্ণয়ে গোঁজামিল, পদোন্নতি, অন্য বিভাগ বা শিফটে বদলি, প্রয়োজনীয় মালামালের, বকেয়া উত্তোলন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অভিযোগের সৃষ্টি হতে পারে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, অভিযোগের ফলে কার্য সম্পাদনের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। তাই প্রতিষ্ঠানের অভিযোগের পরিমাণ লাঘবের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অভিযোগ পরিচালনা / নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া (*Grievance Handling Procedure*)

অভিযোগ পরিচালনা যে কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানকে সতর্কতার সাথে কতকগুলো পদক্ষেপ নিতে হয়। এ সমস্ত পদক্ষেপের সুষ্ঠু প্রয়োগের মধ্যেই অভিযোগ পরিচালনার সাফল্য নিহিত থাকে। একটি প্রতিষ্ঠানকে অভিযোগ পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় নিচে তা সংক্ষেপে বর্ণিত হলো ঃ

১। অভিযোগের বর্ণনাদান (Statement of Grievances) ঃ এটি অভিযোগ পরিচালনার প্রাথমিক পদক্ষেপ। প্রতিষ্ঠানে অনেক প্রকারের অভিযোগ দেখা দিতে পারে। এর মধ্যে গুরুত্বানুযায়ী অভিযোগগুলোকে চিহ্নিত করে পর্যায়ক্রমে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা নেয়া উচিত। অধিক গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। সুতরাং অভিযোগ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রথমেই অভিযোগের প্রকৃতি, সংজ্ঞা ও গুরুত্ব নির্ধারণ করে তার সুস্পষ্ট বর্ণনা দিতে হবে।

২। তথ্য সংগ্রহ (Gathering Facts) ঃ অভিযোগের সঠিক সংজ্ঞা দেয়ার পরবর্তী পদক্ষেপে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য (Relevant Facts) খুঁজে বের করতে হবে। অভিযোগটির উৎস কি, কেন সংঘটিত হয়েছে, কোন প্রকার পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না, কোথায় অভিযোগটি সংঘটিত হয় এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কারা। সর্বোপরি কোন পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে অভিযোগটি বিস্তৃতি লাভ করে। কেননা সংশ্লিষ্ট সমস্ত তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রকৃত কারণ ও উৎসকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজতর হয়।

৩। প্রাথমিক সামাধান বের করা (Establishing Tentative Solutions) ঃ পরিষ্কার চিত্র পাওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপে অভিযোগের প্রাথমিক সমাধান বের করতে হয়। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান কতকগুলো কৌশল অবলম্বন করতে পারে। অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনুরূপ ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ বা সমাধান প্রয়োগ করতে পারে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অনুরূপ ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে তাও অনুসরণ করতে পারে। বিভিন্ন কারিগরি ও ব্যবসায়িক পত্রিকা বা সাময়িকী থেকে বিকল্প পন্থা খুঁজে বের করা যেতে পারে। উপরের কোন পন্থায় সম্ভব না হলে ব্যবস্থাপক বা নির্বাহীদেরকে স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত বিচার বুদ্ধির মাধ্যমেই অভিযোগের সমাধান বের করতে হয়। তবে এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, প্রতিটি সমাধানের ক্ষেত্রেই বিকল্প সমাধানের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

৪। প্রাথমিক সমাধান যাচাই (Checking Tentative Solutions) ঃ এটা অনেকটা ল্যাবরেটরীতে পরিচালিত পরীক্ষা নিরীক্ষার অনুরূপ। এতে প্রাথমিক সমাধানটি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্লেষণ সম্ভব হয় এবং সমাধানটির সঠিকতা ও ফলপ্রদতা যাচাই করা যায়। এক্ষেত্রে দু'টো সম্ভাব্য কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়। প্রথমত, নির্বাহীরা পরখ ও ভ্রান্তি (Trial and Error) পদ্ধতির উপর নির্ভর করতে পারে অথবা সিদ্ধান্তটি প্রয়োগ করেও এর কার্যকারিতা যাচাই করতে পারে। তবে এটা অত্যান্ত ঝুঁকিপূর্ণ, তবুও নির্বাহীরা সময়ের স্বল্পতার জন্য এ পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে। দ্বিতীয়ত, নির্বাহীরা নিজস্ব অভিজ্ঞতা বা অন্যান্যদের অভিজ্ঞতার আলোকেও বিকল্প পন্থাসমূহের মূল্যায়ন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই অনুরূপ বিষয়ে পূর্ববর্তী সাফল্য ও ব্যর্থতার তথ্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

৫। সমাধান প্রয়োগ (Applying Solutions) ঃ কোন কর্মীর অভিযোগ শুনে তার সমাধান বের করলেই শুধু অভিযোগ দূর হয় না। সমাধানটির বাস্তব প্রয়োগ ঘটাতে হয়। অবশ্য সমাধানের প্রয়োগ সমাধান বের করার মতই কষ্টসাধ্য। তাই এ ক্ষেত্রে নির্বাহী এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অত্যন্ত দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে পদক্ষেপ নিতে হয়। নচেৎ সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে।

৬। অনুবর্তন (Follow up) ঃ এটা অভিযোগ পরিচালনার সর্বশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। অভিযোগ পরিচালনা কার্যক্রমের ফলপ্রসূতা এক্ষেত্রে যাচাই করা হয়। সমাধান প্রয়োগের পর অভিযোগের পরিমান হ্রাস পেয়েছে কিনা এ পর্যায়ে যাচাই করা হয়। এ বিষয়ে নির্বাহীদেরকে অবশ্যই একটি সুনির্দিষ্ট সময়সূচী ও পদ্ধতি অনুসরণ করে চলতে হয়। এক্ষেত্রে নির্বাহীরা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কর্মীদের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি যাচাই এবং কর্মীদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমেও অনুবর্তনের কাজ করতে পারে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের অগোচরে অন্যান্য কর্মচারীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তথ্য জেনে নিতে পারে। অবশ্য অনেকে একে গুপ্তচর বৃত্তির সামিল বলে মনে করলেও অভিজ্ঞ লোকের মাধ্যমে এটা করাতে পারলে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়।

পরিশেষে বলা যায়, কর্মীদের কর্ম অসন্তুষ্টি লাঘবের উদ্দেশ্যে অভিযোগ পরিচালনা বা দূরীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপরের পদক্ষেপগুলোর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে যে কোন প্রতিষ্ঠানেই সফলতা অর্জনের পথ সুগম হবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

হ্যান্ডআউট ২.৪ ঃ শৃঙ্খলা বিধান(Disciplinary Actions)

শৃঙ্খলা *(Discipline)*

সাধারণ অর্থে শৃঙ্খলা বলতে নিয়মকানুন মেনে চলার অবস্থাকে বুঝায়। অন্যভাবে বলা যায়, শৃঙ্খলা হলো মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণের কতকগুলো নিয়মনীতি। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই লিখিত বা অলিখিত আচরণবিধি ও নিয়মাবলী থাকে যার ভিত্তিতে কর্মীদেরকে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সার্বিকভাবে সম্পাদন করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

শৃঙ্খলা বিধান*(Disciplinary Actions)*

কর্মীদের সুশৃঙ্খল আচরণ ও নিয়মনীতি যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলার অবস্থা প্রকাশ পায়। কর্মীরা যখন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ, নির্দেশ ও আইনকানুন সঠিকভাবে অনুসরণ করে, তখন প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা উত্তম বলে অভিহিত করা যায়। আর যে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা বিধিবিধান মেনে চলে না বা ইচ্ছাকৃত আইন লঙ্ঘন করে সে প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলাবিধানের সমস্যা রয়েছে তা স্পষ্ট।

শৃঙ্খলাবিধান কাজে সাধারণত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষনীয়। যদিও অধিকাংশ কর্মী এমনিতেই প্রতিষ্ঠানের আদেশ, নির্দেশ ও নিয়মনীতি পালন করে চলে, তবুও কিছু কিছু রয়েছে যাদেরকে জোরপূর্বক নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এমতাবস্থায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার প্রয়োজনে ব্যবস্থাপনাকে শৃঙ্খলাবিধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়।

শৃঙ্খলাবিধান কাজ হলো শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা যা কর্মীদেরকে অনাকাঙ্খিত আচরণ থেকে বিরত রাখে। শৃঙ্খলাবিধান একটি প্রক্রিয়া যা অধঃস্তনদেরকে নিয়মনীতি বা পদ্ধতি পরিপন্থী কাজের কারণে ভুলত্রুটি সংশোধন বা শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করে। শৃঙ্খলাবিধান কার্যে গৃহীত ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে সতর্কীকরণ, পরামর্শ প্রদান, জরিমানা, অপসারণ, তিরষ্কার, কর্মচ্যুতি প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়।

শৃঙ্খলাবিধানের প্রক্রিয়া*(Process of Disciplinary Action)*

প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলাবিধানে কতকগুলো পর্যায় বা ধাপ অনুসরণ করতে হয় এবং এ ধাপে ক্রমান্বয়ে শাস্তির পরিমান বাড়ানো হয়। চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিসেবে চাকরিচ্যুতির পূর্বে কর্মীকে সংশোধনের সুযোগ দেয়াই এর উদ্দেশ্য। শৃঙ্খলাবিধান কার্যে সচরাচর যে সমস্ত ধাপ অতিক্রম করা হয় সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

১. মৌখিক সতর্কতা ***(Verbal Warnings)*** ঃএটা শৃঙ্খলাবিধান কার্যের প্রথম পদক্ষেপ। এতে কর্মীদেরকে ভুল সম্পর্কে মৌখিকভাবে সতর্ক করে দেয়া হয় যাতে কর্মীরা উপলব্ধি করে যে এহেন কাজ মোটেই অভিপ্রেত নয়। সাধারণত ছোট খাট ভুলত্রুটি শোধরানোর জন্য এরূপ কাজ করা হয়।

২. মৌখিক ভর্ৎসনা*(Verbal Reprimand)* ঃ এ পর্যায়ে অভিযুক্ত কর্মীকে কঠোর ভাষায় তিরষ্কার করা হয়। তবে সহকর্মীদের সামনে এরূপ তিরষ্কার করা উচিত নয়। কেননা শৃঙ্খলাবিধান কার্যের উদ্দেশ্য হলো কর্মীকে সংশোধন করা, তাকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা বা তার ব্যক্তিত্বে আঘাত হানা নয়। কারণ এতে কর্মীর মনোবল হ্রাস পায়।

৩. লিখিত ভর্ৎসনা*(Written Reprimand)* ঃ এটা শৃঙ্খলাবিধান প্রক্রিয়ার তৃতীয় ধরন। এটা নির্দিষ্ট নিয়মমাফিক করা হয়ে থাকে। এ পর্যায়ে লিখিতভাবে অভিযুক্ত কর্মীকে তিরষ্কারের পাশাপাশি চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের হুশিয়ারী দেয়া হয়। এক্ষেত্রে একটি লিখিত প্রতিবেদন তৈরী করা হয়ে থাকে এবং কর্মীকে পূর্ববর্তী মৌখিক সতর্কতা সম্পর্কেও উল্লেখ করা হয়। অপরাধের পরিণতি সম্পর্কেও এতে চূড়ান্তভাবে জানিয়ে দেয়া হয়।

৪. সাময়িক চাকরিচ্যুতি বা বরখাস্ত*(Suspension)* ঃ উপরোক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বনের পরেও যদি কর্মীকে সংশোধন করা না যায় এবং কর্মী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে পুনঃ পুনঃ অপরাধ করে তবে তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা যায়। এতে সমস্যাটির সন্তোষজনক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত কর্মী কাজ করতে পারে না এবং তাকে সে সময়কালের মজুরিও প্রদান করা হয় না। অবশ্য বাংলাদেশের সরকারি অফিসে *Suspension allowance* হিসেবে কিছু অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে যা মূল বেতনের অর্ধেক ও অন্যান্য ভাতাসহ নির্দিষ্ট উপায়ে হিসাব করা হয়। এ ধাপে কর্মীর অপরাধের তীব্রতানুযায়ী নির্বাহীদের কঠোর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় যাতে কর্মী অপরাধের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে।

৫. বেতন ও মজুরী কর্তন*(Pay Cut)* ঃ মজুরী কর্তন শৃঙ্খলাবিধানে কদাচিৎ ব্যবহৃত একটি ধাপ। এ ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ভঙ্গজনিত অপরাধের জন্য বেতন বা মজুরী কর্তন করা হয়। যতদিন পর্যন্ত কর্মী নিজেকে সংশোধন না করছে ততদিন পর্যন্ত বেতন বা মজুরি কর্তন চলতে থাকবে। এমনকি এক বা একাধিক ইনক্রিমেন্ট কেটে দিতে পারে।

৬. পদাবনতি*(Demotion)* ঃ গুরুতর কোন অপরাধ প্রমানিত হলে পদাবনতি হতে পারে। এটি একটি গুরুত্বর শাস্তি। এটা কর্মীদের মনোবলের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ জন্য যতদূর সম্ভব এ ব্যবস্থা পরিহার করা উচিত।

৭. চাকুরিচ্যুতি*(Discharge/Dismissal)* ঃ এটা শৃঙ্খলাবিধান প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পদক্ষেপ। উপরিউক্ত কোন অবস্থাতেই যখন কর্মীকে সংশোধন করা যায় না তখন কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত কর্মীকে চাকরিচ্যুত করতে বাধ্য হয়। এ ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠান একজন কর্মীকে হারালেও অনুরূপ অপরাধের পুনরাবৃত্তি হ্রাস পায়। এতে প্রতিষ্ঠান নিজস্ব স্বার্থ ও কর্মীদের স্বার্থ রক্ষা করতে সক্ষম হয়। অপরাধের তীব্রতা বেশী হলে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ রক্ষাকল্পে বরখাস্ত ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। এরূপ অবস্থায় কর্মীদের কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। তবে প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুয়িটি প্রভৃতি দিতে হয়।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলাবিধানে যে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। তবে প্রথমেই কঠোর শাস্তি প্রদান করা উচিত নয়। লঘু শাস্তি থেকে ক্রমশ কঠোর শাস্তির দিকে অগ্রসর হতে হবে, যাতে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা সংশোধনের সুযোগ পায়। আবার সব কর্মীকে একইভাবে শাস্তি দেয়া উচিত নয়। তবে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ একটি চাকরি বিধি প্রণয়ন করে পূর্ব থেকে অপরাধ ও শাস্তির বিষয়গুলোকে কর্মীদের অবগতির মধ্যে আনলে এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের হার কমে যাবে।

শৃঙ্খলাবিধান কার্যের পদক্ষেপসমূহ *(Steps for Disciplinary Action)*

যদিও শৃঙ্খলাবিধানে কোন বাঁধাধরা প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি নেই এবং কোন পূর্ব নির্ধারিত সূচিপত্রও এতে মেনে চলা কঠিন, তথাপি এ কাজে কতকগুলো পদক্ষেপ অনুসরণ করতে দেখা যায়। নিচে শৃঙ্খলাবিধানের পদক্ষেপগুলো বর্ণনা করা হলো ঃ

১. শৃঙ্খলা সমস্যার সঠিক বিবরণ *(Accurate Statement of Disciplinary Problems)* ঃ এটা শৃঙ্খলাবিধানের প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ পর্যায়ে শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণ খুঁজে বের করা হয়। কারণ খুঁজতে গিয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখেই শৃঙ্খলা বিষয়ক সমস্যাটি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা নেয়া উচিত। এর ফলে সমাধান খুঁজে বের করা সহজসাধ্য হয়।

(ক) শৃঙ্খলা ভঙ্গের প্রকৃতি
(খ) অপরাধের পূর্ণ বিবরণ
(গ) কোন অবস্থায় তা সংঘটিত হয়েছিল তার বর্ণনা দান
(ঘ) শৃঙ্খলা ভঙ্গের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের নাম ও বিবরণ
(ঙ) কখন এবং কোথায় কি পরিস্থিতিতে অপরাধটি সংঘটিত হয়

২. তথ্য সংগ্রহ *(Gathering Facts)* ঃ এ পর্যায়ে সমস্যার উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত ঘটনা পর্যালোচনা করে তথ্য সংগ্রহ করতে হয় এবং ব্যবস্থাপনার নিকট তা পেশ করা হয়। এ পর্যায়ে নিম্নোক্ত কতকগুলো বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হয়ঃ

(ক) সমস্ত তথ্য যেন নির্ভুল হয়
(খ) সমস্যার খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয়ই বিবেচনায় আনা হয়
(গ) সংগৃহীত তথ্য যাতে উত্তমরূপে যাচাই করা হয়,
(ঘ) সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি যাতে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

৩. প্রাথমিক শাস্তি বিধান *(Establishing Tentative Penalties)* ঃ সংগৃহীত তথ্য বিচার বিশ্লেষণ করে অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা হবে কি হবে না সে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। শাস্তির ধরন ও প্রকৃতি পূর্বেই নির্ধারণ করে নিতে হবে। শাস্তি প্রদান করা না হলে কর্মীর গঠনমূলক, ইতিবাচক ও আত্মশৃঙ্খল *(Self-discipline)* দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ব্যবস্থা নিতে হবে। শাস্তি প্রদান করা হলে শাস্তির ধরন সম্পর্কে সজাগ থাকা উচিত।

৪. দন্ড নির্বাচন *(Choosing Penalty)* ঃ এক্ষেত্রে কোন অভিযোগকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে কতকগুলো বিকল্প শাস্তি প্রদান ব্যবস্থা নির্বাচন করা হয়। অতঃপর বিকল্পগুলো হতে সঠিক ও উপযুক্ত দন্ডটি নির্বাচন করা হয়। দন্ড নির্বাচনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার আলোকে পূর্বে অনুরূপ ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থাদি বিবেচনায় আনতে হয়। তবে একজন কর্মীকে অবশ্যই সংশোধনের সুযোগ দেয়া উচিত এবং দন্ড নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে পরামর্শ করা উচিত।

৫. দন্ড প্রয়োগ ***(Applying Penalty)*** ঃ শৃঙ্খলাবিধান কার্যের এটা পঞ্চম পদক্ষেপ। দন্ড প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকদের ইতিবাচক ও নিশ্চিত মনোভাব গ্রহণ করা উচিত। এতে নির্বাহীদের অবশ্যই গৃহীত সিদ্ধান্তটির নির্ভুলতা ও সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

যখন শাস্তি প্রদান ব্যবস্থাপনায় শুধুমাত্র সাধারণ সতর্ক করা হয় তখন নির্বাহীকে শান্তভাবে ও দ্রুততার সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আবার যখন দৃষ্টান্তমূলক ও কঠোর দন্ড প্রদান করা হয় তখন নির্বাহীকে অবশ্যই তাৎক্ষনিক কঠোর ও দৃঢ় মনোভাব পোষণ করা উচিত। এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে কোন কারণে যদি কোন দন্ড প্রদানে অহেতুক বিলম্ব করা হয় তাহলে ব্যবস্থাপনার সততা সম্পর্কে কর্মীরা সন্দিহান হয়ে উঠে।

৬. শৃঙ্খলাবিধান কার্য অনুসরন ***(Follow-up Disciplinary Action)*** ঃ শৃঙ্খলাবিধান কার্যের মূল লক্ষ্য প্রতিষ্ঠানে উত্তম শৃঙ্খলা আনয়ন করে কর্ম সম্পাদনা সুষ্ঠু করা। এর আরেকটি উদ্দেশ্য হলো অবাধ্যতার পরিমাণ হ্রাস করা। সুতরাং শাস্তি প্রদানের পর এর কার্যকারিতা মূল্যায়ন আবশ্যক। এর অর্থ এই যে, সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সতর্ক তত্ত্বাবধানে রাখা উচিত। কর্মীদের মনে এমন উপলব্ধিবোধ জাগানো উচিত যে তাদের এবং প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে ব্যবস্থাবলি গৃহীত হয়েছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন শৃঙ্খলাবিধান কার্যের পূর্ব নির্ধারিত বাঁধাধরা পদক্ষেপ অনুসরণ করা প্রায় অসম্ভব। তবে উপরের পদক্ষেপসমূহ যথাযথ অনুসরণ করা হলে শৃঙ্খলাবিধান ব্যবস্থা সফলতা বয়ে আনবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

শৃঙ্খলাবিধান কালে বিবেচ্য বিষয় *(Factors to Consider when Disciplining)*

যথাযথ শৃঙ্খলাবিধান কার্য পরিচালনায় কতকগুলো বিষয় বিবেচনায় আনতে হয়। কেননা মনে রাখতে হবে লঘু অপরাধে যেন গুরু দন্ড না হয়। তদ্রুপ গুরুতর অপরাধ করে কেউ যেন পার না পেয়ে যায়। মোটকথা, সবার প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে। শৃঙ্খলাবিধানের বিবেচ্য বিষয়সমূহ নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

১. সমস্যার গুরুত্ব ***(Seriousness of the Problem)*** ঃ প্রথমে অপরাধটির গুরুত্ব বিবেচনায় আনতে হবে। অপরাধের ভার ও প্রকৃতি দেখে শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন ঃ অসাধুতা এবং কয়েকটি মিনিট বিলম্বে কর্মস্থলে উপস্থিতি এক রকম অপরাধ নয়।

২. সমস্যার স্থিতিকাল*(Duration of the Problem)* ঃ কর্মী কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের পুনরাবৃত্তি কিরূপ তা দেখতে হবে। প্রথম অপরাধ এবং তৃতীয় ও চতুর্থবার পুনরাবৃত্তি হলে তার শাস্তি একইরূপ হওয়া উচিত হবে না। একই অপরাধে পুনরাবৃত্তির উপর নির্ভর করে শাস্তির পার্থক্য নিরূপন করতে হবে।

৩. অপরাধের প্রকৃতি ও সংঘটনের হার ***(Frequency and Nature of Problem)*** ঃ বর্তমান অপরাধটি কর্মী হঠাৎ করে করেছে না তার মধ্যে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অবিরাম অনুবৃত্তির প্রবণতা রয়েছে তা লক্ষ্য রাখতে হবে। হঠাৎ করে কোনরূপ ভ্রান্তি ও অসদাচরণ আর অবিরাম অনুবৃত্তির জন্য শাস্তির প্রকৃতি এক হওয়া উচিত হবে না। তাছাড়া পরিস্থিতি বিবেচনা করে শাস্তির পার্থক্য দেখা দিতে পারে।

৪. অপরাধের গুরুত্ব লাঘব করার উপাদান*(Extenuating Factors)* ঃ অপরাধের গুরুত্ব লঘু করে দেখার কোন সুযোগ বা পরিস্থিতি রয়েছে কিনা তা বিচার বিবেচনায় আনতে হবে। কেননা মায়ের মৃত্যুজনিত কারণে বিনা অনুমতিতে অফিসে না আসা, আর বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার জন্য অফিস কামাই করা একরূপ অপরাধ নয়।

৫. সামাজিকীকরণের পরিমাণ*(Degree of Socialization)* ঃ ব্যবস্থাপনা কর্মীদেরকে প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতি, আদর্শ ও আচরণবিধি এবং অসদাচরণ ও নিয়মনীতি ভঙ্গের পরিনাম সম্বন্ধে কতটুকু অবগত করেছে তাও বিচার্যের বিষয়। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানে চাকরি বিধিও অপরাধের ধরন ও শাস্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও লিখিত বিধান রয়েছে কিনা তাও দেখতে হবে।

৬. প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলাবিধান কার্যের ইতিহাস*(History of Organizations Discipline Practice)*ঃ অতীতে প্রতিষ্ঠান একইরূপ শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য কিরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করেছে তা খতিয়ে দেখতে হবে। শাস্তিবিধানে কোনরূপ বৈষম্য বা অনুকূল্য প্রদর্শন করা যাবে না। একইরূপ অপরাধে কেউ শাস্তি পায়, আর কেউ অপেক্ষাকৃত কম বা শাস্তি না পায় তাহলে শৃঙ্খলাবিধান পদ্ধতির উপর কর্মীদের আস্থা নষ্ট হবে। এতে শৃঙ্খলাবিধান কার্যের কার্যকারিতা হ্রাস পায়।

৭. ব্যবস্থাপনার সমর্থন*(Management Backing)* ঃ কর্মীর অপরাধের জন্য শাস্তিবিধানের উপর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সমর্থন কিরূপ তা বুঝতে হবে। শাস্তিবিধান ব্যবস্থায় অবশ্যই নিশ্চিত হবে যে শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট এর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে কোনরূপ সুবিধা আদায় করতে পারবে না।

উপরের উপাদানগুলো শাস্তিবিধান প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারে। প্রতিষ্ঠানের কৃতকার্যতার জন্য শৃঙ্খলাবিধান অত্যন্ত প্রয়োজন। কর্মীর অনুপস্থিতি, কার্যকালীন অসদাচরণ, আইন অমান্য, অসততা ও কর্মবহির্ভূত নানাবিধ অপরাধের সাথে যুক্ত হতে পারে। তাই অপরাধের গুরুত্ব মূল্যায়ন করেই শাস্তির বিধান করা বাঞ্চনীয়।

অধ্যায় তিনঃ মানবিক আচরণ অনুধাবন (Understanding Human Behaviour)

- অধিবেশন ৩.১ ঃ উদ্বুদ্ধকরণ **(Motivation)**
- অধিবেশন ৩.২ ঃ কার্যকর যোগাযোগ **(Effective Communication)**
- অধিবেশন ৩.৩ ঃ দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা **(Conflict Management)**
- অধিবেশন ৩.৪ ঃ কর্মী পরামর্শ **(Employee Counselling)**

হ্যান্ডআউট ৩.১ ঃ উদ্বুদ্ধকরণ(Motivation)

সংজ্ঞা

ইংরেজী *Motivation* শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো উদ্বুদ্ধকরণ। কোথাও কোথাও একে প্রেষণাও বলা হয়ে থাকে। এ ইংরেজী শব্দটি ল্যাটিন *'Movere'* শব্দ হতে এসেছে। যার অর্থ *to move* অর্থাৎ চালনা করা, গতিশীল করা। মানুষের ইচ্ছা বা আকাঙ্খাকে প্রভাবিত করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলার আগ্রহ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে উদ্বুদ্ধকরণ বলে। অন্যভাবে বলা যায়, উদ্বুদ্ধকরণ হলো প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীবৃন্দের কার্যক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত ও প্ররোচিত করার প্রক্রিয়া।

উদ্বুদ্ধকরণের মূল অর্থ একজন ব্যক্তির প্রয়োজন, আকাঙ্খা এবং ধারণাসমূহ যা তাকে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে কাজ করতে উৎসাহ দেয়।

উদ্বুদ্ধকরণ হলো ব্যবস্থাপক কর্তৃক সে ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ যা কর্মীবৃন্দকে নির্ধারিত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে উৎসাহিত ও প্রণোদিত করে।

উদ্বুদ্ধকরণ হলো এমন একটি সাধারণ ধারণা বা বিষয় যা সকল শ্রেণীর তাড়না, ইচ্ছা, প্রয়োজন, আকাঙ্খা এবং এ ধরনের শক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।

উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে,

১. উদ্বুদ্ধকরণ কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত তাড়না, অভিপ্রায়, ইচ্ছা-আকাঙ্খা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত;
২. ব্যক্তির এরূপ মানসিক অবস্থা বা ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে তার আচরণের মধ্য দিয়ে;
৩. এরূপ ইচ্ছা বা আগ্রহকে প্ররোচত করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যপানে এগিয়ে নেয়া সম্ভব;
৪. কর্মী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হলে কাজে তার প্রভাব পড়ে; এবং
৫. কর্মীকে কাজে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত করাই উদ্বুদ্ধকরণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্বুদ্ধকরণ হলো কর্মীদের ইচ্ছাশক্তিকে কাজের প্রতি অনুপ্রাণিত বা উৎসাহিত করার এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কর্মীদের নিকট হতে স্বতঃস্ফুর্ততার সাথে ও সন্তুষ্টি সহকারে তাদের কর্মদক্ষতার সর্বোচ্চ ব্যবহারের নিশ্চয়তা লাভ করা যায়। কাজ করার আগ্রহের সাথে কাজ করার দক্ষতা ও যোগ্যতার প্রশ্নটিও জড়িত। তাই কার্য সম্পাদন বলতে ব্যক্তির সামর্থ ও কাজ করার ইচ্ছা বা আগ্রহের গুণফলকে বুঝায় *(P = A x M)*বা *(Performance = Ability x Motivation)*।

মাসলোর উদ্বুদ্ধকরণ সোপান তত্ত্ব

অভাব ও এর পরিতৃপ্তির সাথে উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়টি বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু অভাব অসীম এবং একটি অভাব পূরণ হলেই আরেকটি অভাব তার স্থান দখল করে। তাই পূরণের সাথে সাথেই অভাব যে এর রূপ পাল্টায় তার উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে সামাজিক সম্পর্ক আন্দোলন (*Human Relations movement*) এর অন্যতম পথিকৃত প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী *Abraham Maslow* যে তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন তাকে *Maslow's Need Hierarchy Theory* বলে।

তিনি তার তত্ত্বে মানুষের চাহিদা বা অভাবকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। যা একের পর এক অবস্থান করে এবং পর্যায়ক্রমিক এদের পরিতৃপ্তির ওপর কর্মীর উদ্বুদ্ধকরণ বিশেষভাবে নির্ভরশীল। মাসলোর চাহিদা সোপান হলো একটি উদ্বুদ্ধকরণ তত্ত্ব যেখানে মনে করা হয় মানুষ পর্যায়ক্রমে পাঁচটি চাহিদা প্রত্যাশা করে; যা হলো- দৈহিক, নিরাপত্তা, অন্যকে আপন করে পাওয়া বা পরস্পরিক মিল ও ভালোবাসা, আত্মতৃপ্তি এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা। নিম্নে রেখাচিত্রের সাহায্যে চাহিদার সোপান প্রদর্শিত হলো ঃ

রেখাচিত্র

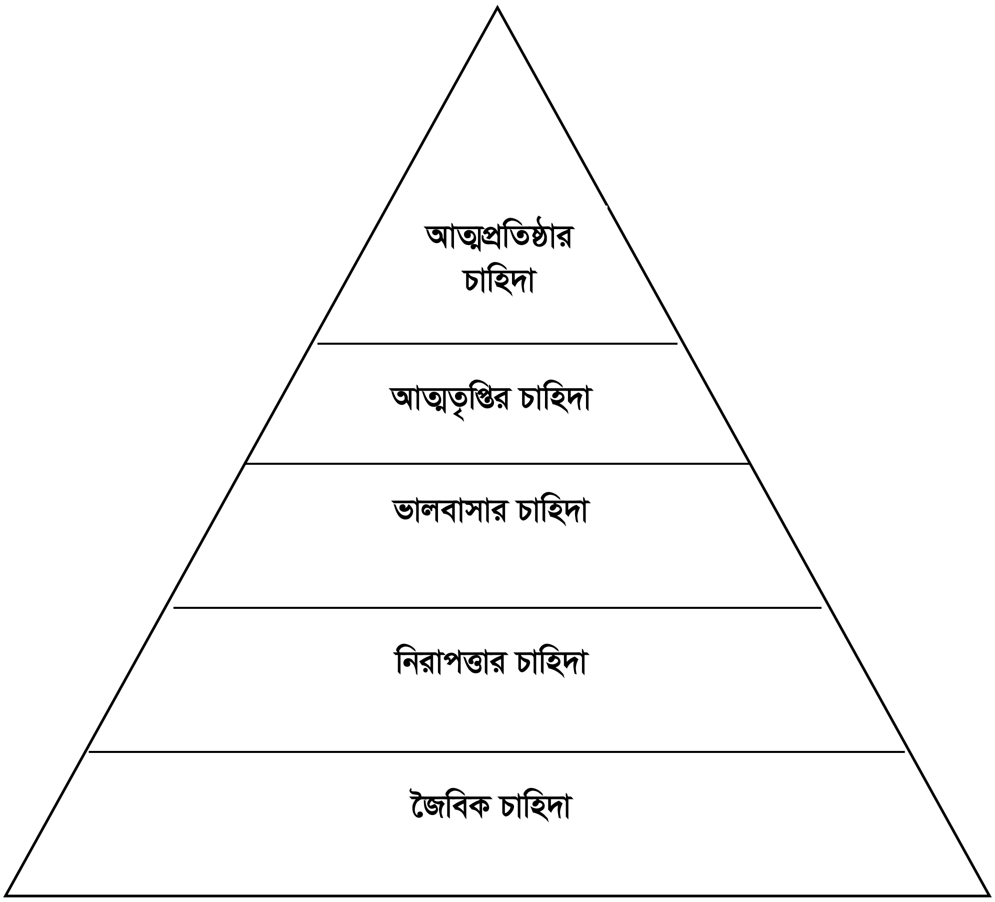

মাসলো প্রদত্ত চাহিদার পর্যায়ক্রমিক স্তর

রেখাচিত্রে প্রদর্শিত চাহিদার স্তরসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

১. জৈবিক / দৈহিক চাহিদা(*Physiological Needs*)ঃনূন্যতম বাঁচার বা জীবন ধারনের প্রয়োজনকে জৈবিক বা দৈহিক চাহিদা বলে। খাদ্য, পানীয়, বাতাস, বস্ত্র ও বাসস্থানের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন এ শ্রেণীর চাহিদার অন্তর্ভূক্ত। জৈবিক চাহিদা হলো মাসলোর চাহিদা সোপানের সর্বনিম্ন স্তর, এর উপাদানসমূহ মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক নিশ্চয়তা দেয়।

২. নিরাপত্তার চাহিদা(*Safety Needs*)ঃ দৈহিক প্রয়োজন পূরণের পর মানুষ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বোধ করে নিরাপত্তার। সে নিজেকে ও তার পরিবারকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকির হাত হতে রক্ষা করতে চায়। এ জন্য সে চায় পেশার বা চাকরির স্থায়িত্ব, কম ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং নিরাপদে বাঁচার সুযোগ। নিরাপত্তা চাহিদার মধ্যে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে সকল ধরনের ভীতি হতে নিরাপদ ও মুক্ত থাকার আকাঙ্খা অন্তর্ভূক্ত।

৩. ভালবাসার চাহিদা(*Love Needs*)ঃমানুষ যখন নিরাপত্তাবোধে তৃপ্ত হয় তখন সে পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী ও সমাজের অন্যদের সাথে মিলেমিশে চলতে ও অন্যদের ভালোবাসা পেতে চায়। একেই সামাজিক চাহিদা বলে। অন্যকে আপন করে পাওয়ার চাহিদা সামাজিক প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত। এর মধ্যে পড়ে প্রেম ও ভালোবাসা এবং নিজ সঙ্গী-সাথীদের স্বীকৃতি। এ পর্যায়ের অভাব পূরণের জন্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে খাবারের কক্ষ, কমিউনিটি রুম, সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ, দলবদ্ধ প্রচেষ্টা উৎসাহিতকরণ ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

৪. আত্মতৃপ্তির চাহিদা(*Esteem Needs*)ঃউপরোক্ত চাহিদাগুলো পূরণ হলে মানুষ কাজের মধ্যে আত্মতৃপ্তির প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। আত্মতৃপ্তির প্রয়োজন একজন ব্যক্তির সুনাম-সুখ্যাতি, যশ, অহংকার ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট। এ ধরনের চাহিদা ক্ষমতা, সম্মান, মর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠার মতো প্রত্যাশার জন্ম দেয়। এ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বড় অফিস, বড় বাসা, সুন্দর গাড়ি, প্রতিযোগিতামুলক কাজ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৫. আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা(*Self Actualization Needs*)ঃ মানব চাহিদার শেষ পর্যায়ে যা মানুষকে আকর্ষিত করে তা হলো আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। এ পর্যায়ে সে তার প্রতিভার সর্বাত্মক রূপায়ণে অগ্রসর হতে চায়। একজন ব্যক্তির সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও ব্যক্তিক উন্নয়ন এ পর্যায়ের চাহিদার অন্তর্ভূক্ত। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কর্মীর এ অবস্থায় প্রত্যাশা পূরণ বেশ জটিল। অধিক কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, গুরুত্বপূর্ণ কাজ, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার ইত্যাদি এ পর্যায়ে ব্যক্তি সন্তুষ্টির সৃষ্টি করতে পারে। ব্যক্তিগত জীবনে এরূপ চাহিদা পূরণে কোন ব্যক্তি শিল্প-সাহিত্য, রাজনীতি, সভা-সমাবেশ, দান-খয়রাত ইত্যাদি কার্যে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজে নিজের সম্পর্কে একটা ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে চায়। সে মৃত্যুর পরও নিজেকে অমর করে রাখার প্রত্যাশী হয়।

চাহিদা তত্ত্বের মৌলিক ধারণাসমূহ ঃ মাসলো তার পর্যায়ক্রমিক চাহিদা তত্ত্বে যে সকল বিষয় ধরে নিয়েছেন তা হলো-

(ক) মানুষের উদ্বুদ্ধকরণ আচরণের উৎস হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের চাহিদা বা অভাব। এর মধ্যে জৈবিক চাহিদা মুখ্য। মানুষ প্রথমেই এ চাহিদা পূরণের চেষ্টা করে। তারপর পর্যায়ক্রমে উচ্চস্তরের চাহিদাগুলো পূরণের চেষ্টা চালায়;

(খ) মাসলো মনে করেন, মানুষ পূর্ববর্তী স্তরের চাহিদাগুলো পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী স্তরের চাহিদা পুরণের চেষ্টা করে না। তবে চাহিদাগুলো পরস্পরের ওপর নির্ভলশীল এবং নিম্নস্তরের একটা অভাব পূরণ না হতেই পর্যায়ক্রমিক পরবর্তী উচ্চস্তরের অভাববোধ ব্যক্তির মনে সৃষ্টি হয় এবং

(গ) যে সকল উপাদানের মাধ্যমে বিদ্যমান স্তরে ব্যক্তির যতবেশি চাহিদা পুরণ সম্ভব সেই সকল উদ্দীপকের ব্যবস্থা করেই ব্যক্তিকে ঐ পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণ করা যায়।

উদ্বুদ্ধকরণের বিভিন্ন উপায় বা পদ্ধতি(*Various Ways or Methods of Motivation*)

আধুনিক ব্যবস্থাপনায় শ্রমিক-কর্মীদের নিকট হতে কাজ আদায়ে উদ্বুদ্ধকরণের গুরুত্ব সকল মহলেই স্বীকৃত। অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের উদ্বুদ্ধকরণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রচলিত থাকলেও একে প্রকৃতি অনুযায়ী আথিক ও অনার্থিক দু'ভাগে ভাগ করা হয়। নিম্নে এদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ

(ক) উদ্বুদ্ধকরণেরআর্থিক উপায় বা পদ্ধতি(*Financial means of motivation*)

১. ন্যায্য বেতন ঃ উচ্চ বেতন স্বভাবতই কর্মীদেরকে উদ্দীপ্ত করে। বেতন বলতে এক্ষেত্রে মূল বেতনকেই বুঝায়। কর্মী যদি তাকে প্রদত্ত বেতন অন্যায্য মনে করে তবে কার্যক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত বোধ করা খুবই স্বাভাবিক; আর এর ফলে কার্যদক্ষতা হ্রাস পায়।

২. মুনাফার অংশ ঃ সাধারণভাবে মুনাফা মালিকের প্রত্যাশা। কর্মীদের যদি মুনাফার একটি অংশ দেয়া হয় তাহলে প্রতিষ্ঠানকে নিজের ভাবতে যেমনি তারা উৎসাহিত হয় তেমনিভাবে মুনাফা বৃদ্ধির জন্য তারা সচেষ্ট থাকে।

৩. বোনাস ঃ বর্তমানকালে কর্মীদের উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য বোনাস একটি ফলপ্রদ পদ্ধতি। একে কর্মীরা বাড়তি পাওনা মনে করে, ফলে কাজে উৎসাহিত হয়। সাধারণত বিভিন্ন পর্ব ও অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বোনাস দেয়া হয়।

৪. আর্থিক নিরাপত্তা ঃ ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা প্রত্যেক কর্মীরই একটি আকাঙ্খিত বিষয়। এ লক্ষ্যে প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি, পেনশন, গ্রুপ বীমা ইত্যাদির সুযোগ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দেয়া হয়।

৫. অগ্রিম ও ঋণ ঃ বর্তমানকালে আমাদের মতো দেশে কর্মীদের বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রভিডেন্ট ফান্ড, বেতন ইত্যাদির বিপক্ষে প্রতিষ্ঠান হতে নির্দিষ্ট সময়ে মাসে মাসে কর্তন করা হবে- এ শর্তে অগ্রীম বা ঋণ প্রদান করা হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সহজ শর্তে তাদের কর্মীদের ঋণ দেয়। এটাও কর্মীদেরকে কাজে উদ্দীপ্ত করে।

৬. বাসস্থান সুবিধা ঃ বাসস্থান মানুষের মৌলিক অভাবেরঅন্তর্ভূক্ত। তাই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এ মৌলিক অভাব পূরণে বাসস্থান সুবিধা প্রদান করে। অনেকক্ষেত্রে বাসস্থানের সুবিধা দেয়া সম্ভব না হওয়ায় প্রতিষ্ঠান কর্মীদের বাসস্থান ভাতা দিয়ে থাকে।

৭. পরিবহন সুবিধাঃ শহরাঞ্চলে কর্মীরা অধিকাংশই দূর হতে কার্যক্ষেত্রে আগমন করে। ফলে যাতায়াতে তাদের সমস্যায় পড়তে হয়। তাই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে পরিবহন সুবিধা প্রদান করা হলে কর্মীরা উৎসাহিত হয়।

৮. চিকিৎসা সুবিধা ঃ কর্মীদের সুস্বাস্থ্য উচ্চ মনোবলের পক্ষে অপরিহার্য। তাই কর্মীদের এবং সম্ভাব্যক্ষেত্রে তার পরিবার পরিজনদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান কর্মীদের উদ্দীপ্ত করার আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপায়।

৯. পদোন্নতি ঃ পদোন্নতির সাথে আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধির প্রশ্ন জড়িত। তাই পদোন্নতি প্রাপ্তির বিষয়টি কর্মীদের মনে উৎসাহ জোগায়। সেজন্য যোগ্য কর্মীকে পদোন্নতি দান ও ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনার দ্বার খোলা রাখা প্রয়োজন।

১০. পুরস্কার ঃ উত্তম কাজের জন্য প্রতিষ্ঠানের আর্থিকভাবে পুরস্কৃত করা যেতে পারে। এতে যারা পুরস্কৃত হয় তারা যেমনি উদ্দীপ্ত হয় তেমনি তাদের ন্যায় অন্যরাও এভাবে পুরস্কৃত হওয়ার লক্ষ্যে নিজেদেরকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করে।

১১. রেশন সুবিধা ঃ নির্দিষ্ট সময়ান্তে কম মূল্যে রেশনে কর্মীদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করে বা প্রতিষ্ঠান উৎপাদিত দ্রব্যাদি কমমূল্যে সরবরাহের মাধ্যমেও কর্মীদের উদ্দীপ্ত করা যায়।

১২. ক্যান্টিন সুবিধা ঃ কার্যকালীন যে সকল প্রতিষ্ঠানে নাস্তা বা খাদ্য খাওয়ার প্রয়োজন পড়ে। সেক্ষেত্রে কেন্টিন সাবসিডি প্রদানের মাধ্যমের কর্মীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রদান ও উৎসাহ সৃষ্টি করা সম্ভব।

(খ)উদ্বুদ্ধকরণের অনার্থিক উপায় বা পদ্ধতি(*Non-financial means of motivation*)

১. ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও অধিকার ঃ কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ভোগ করার ইচ্ছা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মৌলিক অধিকার পূরণের সাথে সে কর্মস্থলে ক্ষমতা ও অধিকার পেতে চায়। তাই এরূপ ক্ষমতা ও অধিকার প্রদত্ত হলে কর্মী বা নির্বাহীগণ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

২. সুষ্ঠু কর্ম পরিবেশ ঃ ফলপ্রদ কাজের পিছনে কর্ম পরিবেশের প্রভাব রয়েছে। কর্মী যেখানে কাজ করে সেই স্থানের পরিবেশ যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পর্যাপ্ত আলো-বাতাসসমৃদ্ধ ও হৈ চৈ মুক্ত হয় তবে তা কর্মীদের মনোবল উন্নত করে। এছাড়া পর্যাপ্ত এবং নারী-পুরুষের জন্য আলাদা টয়লেট, কর্মীদের জন্য কেন্টিন, বিশ্রামাগার, প্রার্থনাগার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৩. নিরাপত্তা ঃ কর্মী কাজের ক্ষেত্রে যদি নিজেকে নিরাপদ না মনে করে তবে তার ওপর একটা মানসিক চাপ পড়ে। ফলশ্রুতিতে কর্মস্পৃহা লোপ পায়। সেজন্য কাজের ক্ষেত্রে ঝুঁকির পরিমাণ যথাসম্ভব কমানোর চেষ্টা করা দরকার। তদুপরি চাকরি যাওয়ার ভয় যাতে তাকে ব্যাকুল না করে সে দিকেও খেয়াল রাখা আবশ্যক।

৪. আকর্ষণীয় কাজঃ কর্মীরা আনন্দদায়ক ও অবদানমূলক কাজে স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণে উৎসাহিত হয়। তাই কাজকে আনন্দপূর্ণ করা এবং কর্মী যে কাজ করছে তার গুরুত্ব তাদের নিকট তুলে ধরার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তদুপরি কর্মীদের প্রবণতা অনুসন্ধান এবং সে অনুযায়ী কাজ করা উচিত।

৫. উত্তম ব্যবহার ঃ ভালো ব্যবহারে যেমন অর্থ ব্যয় হয় না তদুপরি এর ফলাফলও অত্যন্ত বেশি। একজন নির্বাহী ও তত্ত্বাবধায়ক যদি তার কাজে দক্ষ হয়, অধঃস্তনদের সাথে সদয় ব্যবহার করে, তাদের সুখে-দুখের সাথী হয়ে এবং যোগ্য শিক্ষক হিসেবে তাদের মানোন্নয়নের চেষ্টা করে, তবে সহজেই অধঃস্তনদের মনে স্বতঃস্ফুর্ত আগ্রহ সৃষ্টি করে কাজ আদায় করা সম্ভব।

৬. ভালো কাজের প্রশংসাঃ মানুষ তার কৃত কার্যের প্রশংসা শুনতে স্বাভাবিকভাবেই উদ্দীপ্ত হয়। তাই কর্মীদের অধিক কাজের জন্য যেমনি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান ও তত্ত্বাবধান করতে হয় তেমনি ভালো কাজের জন্য প্রশংসা করা উচিত।

৭. প্রশিক্ষণ সুবিধা ঃ উত্তম প্রশিক্ষণ কর্মীদের দক্ষতা ও মনোবল বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। এটি কর্মীদের পদোন্নতি লাভে বা অধিক দায়িত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণে সক্ষম ও সাহসী করে তোলে। তাই উত্তম প্রশিক্ষণ সুবিধা কর্মীদের প্রণোদনা সৃষ্টির একটি অন্যতম উপায়।

৮. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ঃ ব্যবস্থাপনা যদি স্বেচ্ছাচারী না হয়ে কর্মীদের চিন্তা-ভাবনার প্রতি মূল্য দেয়, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরামর্শ গ্রহণ করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের মতামত নেয় এবং অভাব-অভিযোগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে তবে নির্বাহী তথা প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্মীদের সু-ধারনার সৃষ্টি হয়। ফলে কার্যক্ষেত্রে তাদের উৎসাহ বাড়ে।

৯. মালিকানায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান ঃ বর্তমান কালে কর্মীদের প্রণোদিত করার উপায় হিসেবে প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে দেখা যায়। কোম্পানীর ক্ষেত্রে শেয়ারের একটি অংশ সহজ শর্তে কর্মীদের মধ্যে বন্টন করা যেতে পারে। এতে কর্মীদের মনে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ও এর কাজে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

১০. সুবিচার প্রতিষ্ঠা ঃ প্রতিষ্ঠানের কার্যে অন্যায়-অবিচার স্বভাবতই কর্মীদের ক্ষুব্ধ করে। প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরে ও সকল কার্যে যদি সুবিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় এবং সকল কর্মীদের সাথে সমান আচরণ করা যায় তা কর্মীদের প্রণোদিত করে।

১১. শ্রমিক সংঘ করার সুযোগ ঃ শ্রমিক সংঘ করার অধিকার বর্তমানকালে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিকদের অন্যতম দাবি হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই শ্রমিক সংঘ করার সুযোগও কর্মীদের উৎসাহের একটি কারণ হয়ে থাকে।

১২. প্রতিষ্ঠানের সুনাম ঃ কর্মী যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তার সুনাম সুখ্যাতিও কর্মীদের মাঝে প্রেরণা যোগায়। ভালো প্রতিষ্ঠান কর্মীরা সহজে ছাড়তে চায় না। বরং তা তাদের গর্বের বস্তুতে পরিণত হয়।

১৩. শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ঃ বর্তমানকালে সন্তান-সন্ততির শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সমস্যা ও ব্যয় অত্যন্ত বেশি। প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীদের সন্তানদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার মাধ্যমেও কর্মীদের অনুপ্রাণিত করা যায়।

১৪. অন্যান্য প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা ঃ কর্মীদের মানসিক প্রশান্তি ও কাজে একঘেঁয়েমি দূর করার জন্য বিভিন্ন প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা; যথা- খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বনভোজন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

হ্যান্ডআউট ৩.২ ঃ কার্যকর যোগাযোগ(Effective Communication)

কার্যকরী যোগাযোগের মাধ্যমে কোন তথ্য সঠিকভাবে প্রদান, তা গ্রহণ ও এর ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়ে থাকে।

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য যোগাযোগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যোগাযোগ একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখা সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এবং কর্মচারীদের কর্মে উজ্জীবিত করে। যোগাযোগ ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানই আংশিক বা সম্পুর্ণভাবে সক্রিয় থাকতে পারে না। এটি মানুষের শরীরের রক্ত-প্রবাহের মতই জরুরী।

যোগাযোগের ধারণা

ল্যাটিন শব্দ ’কম্যুনিস’ (Communis), যার অর্থ ’সাধারণ’ (Common) শব্দটি থেকে যোগাযোগ শব্দটির উৎপত্তি। যখন আমরা কারও সঙ্গে যোগাযোগ করি তখন আমরা সাধারণীকরণের (Commonness) বা একই রকম অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে যোগাযোগের চেষ্টা করি। তাই আমরা তখন আমাদের তথ্য, ধারণা/অনুমান, অথবা আচরণের আদান-প্রদানের সমঅংশীদার হই (শ্র্যাম)।

“যোগাযোগ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো বার্তা উৎস থেকে গ্রাহক/শ্রোতার কাছে পৌঁছায়” (ই.এম.রজার্স)। “যোগাযোগ হলো একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া যেখানে দুই দিক থেকেই বার্তা প্রবাহিত হয় এবং পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভিত্তিতে ফলাফল আবর্তিত হয়” (জন.সি.ম্যারিল ও আর.এল.লয়েনসস্টাইন)।

যোগাযোগের প্রকারভেদ

ক) অন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ (Intrapersonal Communication) ঃ নিজের সঙ্গে ব্যক্তির নিরন্তর যে একান্ত যোগাযোগ সেটিই হলো অন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ। ব্যক্তি মূলত অন্য সকল প্রকার যোগাযোগর শুরুই করে নিজের সঙ্গে নিরন্তর বোঝাপড়া, একান্ত চিন্তা-ভাবনা এবং বিচার/বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। আর এভাবে সে অন্য সব ধরনের যোগাযোগ কৌশল অন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের মাধ্যমেই নির্ধারণ করে থাকে। যেমনঃ উপস্থাপক হিসেবে ব্যক্তি মূল পরিবেশনার আগে কী উপস্থাপন করবেন, কাদের উদ্দেশে করবেন, কীভাবে তা উপস্থাপন করবেন ইত্যাদি কর্ম-কৌশল মনে মনে ঠিক করে নেন।

খ) আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ ((Interpersonal Communication) ঃ কোনো প্রকার যন্ত্রোপকরণের সহায়তা ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা দল কর্তৃক অন্য কোনো ব্যক্তি বা দলের সঙ্গে যোগাযোগ করাকে বলা হয় আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ। এখানে উভয় পক্ষেরই (উৎস ও প্রাপক) শারীরিকভাবে উপস্থিতির ব্যাপারে বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। যেমনঃ রুমমেটের সঙ্গে কথা বলা কিংবা বিদ্যালয়ে বা প্রশিক্ষণ কোর্সের শ্রেণী কার্যক্রমের আলোচনায় অংশগ্রহণ করা আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের উদাহরণ। এধরনের যোগাযোগে উৎস ও প্রাপকের পারস্পরিক উপস্থিতি ও তাৎক্ষণিক ফিডব্যাক রয়েছে বিধায় এটি হলো মূলত দ্বিমুখী যোগাযোগ (Two-way communication)।

গ) গণযোগাযোগ (Mass Communication) ঃ গণযোগাযোগ একটি প্রক্রিয়া যেখানে এক বা একাধিক যন্ত্র-মাধ্যমের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বহুমাত্রিক ও বিচিত্র শ্রেণী-পেশার লোকজনের উদ্দেশ্যে একইসঙ্গে বার্তা প্রেরণ করা হয়। এধরনের যোগাযোগে তাৎক্ষনিক সাড়া বা ফিডব্যাক-এর সুযোগ থাকে না বিধায় এটি মূলত একমূখী যোগাযোগ (One-way communication)।

এছাড়া, আন্তঃবক্তিক যোগাযোগ ও গণযোগাযোগের সংমিশ্রনে আরও কয়েক ধরনের যোগাযোগের সঙ্গে আমরা পরিচিত; যেমনঃ দলগত যোগাযোগ, পাবলিক কমিউনিকেশন, পাবলিক স্পিকিং ইত্যাদি। এধরনের যোগাযোগে এক বা একাধিক উৎস বা পক্ষ মেকানিক্যাল ডিভাইস ব্যবহার করে একইসঙ্গে একাধিক রিসিভারের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকে। এটি একইসঙ্গে সোর্স এবং রিসিভারকে স্থান-কাল-পাত্রভেদে কখনও কখনও আলাদাও করে দেয়।

যোগাযোগ প্রক্রিয়ার উপাদান

যোগাযোগের ৮টি উপাদান উল্লেখ করা হলো। যার মধ্যে মূলত ৪টি উপাদানই প্রধান। এগুলো হলো- Source, Message, Channel and Receiver (SMCR)

ক. উৎস (Source)
খ. সংকেতাবদ্ধকরণ প্রক্রিয়া (Process of encoding)
গ. মেসেজ বার্তা (Message)
ঘ. মাধ্যম (Channel)
ঙ. সংকেত উন্মোচক (Process of decoding)
চ. প্রাপক (Receiver)
ছ. ফলাবর্তন (Feedbsck)
জ. গোলযোগ(Noise)

যোগাযোগ প্রক্রিয়া

চিত্র-১ এ যোগাযোগ প্রক্রিয়াটি দেখান হয়েছে। এখানে প্রেরক একটি বিশেষ মাধ্যমে প্রাপকের কাছে তথ্য প্রেরণ করছে। নিম্নে যোগাযোগের বিভিন্ন ধাপগুলো বিশ্লেষন করা হলো ঃ

তথ্যের প্রেরক(Sender)

যোগাযোগ প্রক্রিয়াটি শুরু হয় প্রেরকের মাধ্যমে। প্রেরক তার তথ্য বা ধারণা এমনভাবে প্রাপকের কাছে পাঠাবেন যা প্রাপকের কাছে বোধগম্য হয়।

তথ্য প্রেরনের মাধ্যম(Media)

তথ্য প্রেরনের মাধ্যমটি এমন হতে হবে যা প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে। তথ্যটি মৌখিক বা লিখিত হতে পারে। এটি স্মারকলিপি আকারে, কম্পিউটার, টেলিফোন, টেলিভিশন বা টেলিগ্রাফের মাধ্যমে প্রেরণ করা যেতে পারে।

তথ্যের প্রাপক(Receiver)

প্রাপক তথ্যটি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। যোগাযোগ তখনই কার্যকরভাবে সম্পন্ন হবে যখন প্রাপক প্রেরকের পাঠানো তথ্য সঠিকভাবে বুঝতে পারবেন।

গোলযোগ (*Noise*)

যোগাযোগে অনেক সময় গোলযোগ বা বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এটা প্রেরক, মাধ্যম অথবা প্রাপক যেকোন জায়গায় ঘটতে পারে বা যে কারও বেলায় ঘটতে পারে। তখন তথ্যটি প্রেরক এর কাছ থেকে প্রাপকের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছাবে না।

কার্যকরী যোগাযোগ ঃ

আমরা ইশারা, ইঙ্গিত, বর্ণমালা, ছবি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদির মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারি। যোগাযোগ সফল হলে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও দক্ষতা বাড়ে; আচরণগত পরিবর্তন ঘটে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে কর্মোদ্যোগ সফল হয়। কার্যকর যোগাযোগ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন উপাদানকে এখানে একটি সরল মডেল হিসেবে উপস্থাপন করা যেতে পারেঃ

Who says (এখানে ‘Who’ হলো যোগাযোগকারী/বক্তা/উৎস; অর্থাৎ যিনি বার্তার পরিবেশক বা সূচনাকারী)
What (এখানে ‘What’ হলো তথ্য/বার্তা)
In which channel (এখানে ‘Channel’ হলো যন্ত্র-মাধ্যম/যন্ত্রোপকরণ/যোগাযোগ মাধ্যম)
To whom (এখানে‘Whom’) হলো বার্তা গ্রাহক/রিসিভার; অর্থাৎ যার উদ্দেশ্যে বার্তা পরিবেশিত)
With what effect (এখানে ‘Effect’ হলো সাড়া/প্রতিবার্তা বা ফিডব্যাক)

কার্যকর যোগাযোগের জন্য ৭টি সি (C) মনে রাখা যেতে পারে-

Candid (প্রাণবন্ত)	ঃ যোগাযোগের জন্য তৈরি বার্তা সহজ ও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরতে হবে;
Clear (পরিষ্কার/স্পষ্ট)	ঃ বিষয়টি যাতে সকলের জন্য বোধগম্য হয়;
Complete (সম্পূর্ণ)	ঃ অসম্পূর্ণ যোগাযোগ বার্তা মানুষকে বিভ্রান্ত করে, ভুল পথে পরিচালিত করে;
Concise (সংক্ষিপ্ত)	ঃ বিষয়টি অনেক বড় হয়ে গেলে মানুষ তা বুঝতে এবং গ্রহণ করতে চায় না;
Concrete (বাস্তবসম্মত)	ঃ যার সাথে যোগাযোগ করা হবে তার কোনো কাজে না আসলে বিষয়টি সে গ্রহণ করতে চায় না;
Correct (সঠিক)	ঃ যোগাযোগের বার্তা নির্ভূল হতে হবে
Courteous(সৌজন্যমূলক)	ঃ সকল ক্ষেত্রেই আচরণে সৌজন্যবোধ রক্ষা করতে হবে।

প্রতিবার্তা (*Feedback*)

যোগাযোগ সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা সেটা বোঝার জন্য অবশ্যই প্রতিবার্তা (*Feedback*) এর প্রয়োজন। প্রতিবার্তার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারব যে যোগাযোগ সুষ্ঠু বা কার্যকরভাবে সম্পাদিত হয়েছে কিনা। যোগাযোগের কারণে কোন কাঙ্খিত পরিবর্তন এসেছে কিনা।

যোগাযোগ সম্পূর্ণ হয় তখনই যখন বক্তা যা বলেন এবং বোঝাতে চান, শ্রোতা তা সঠিকভাবে শুনতে পারে এবং বুঝতে পারে।

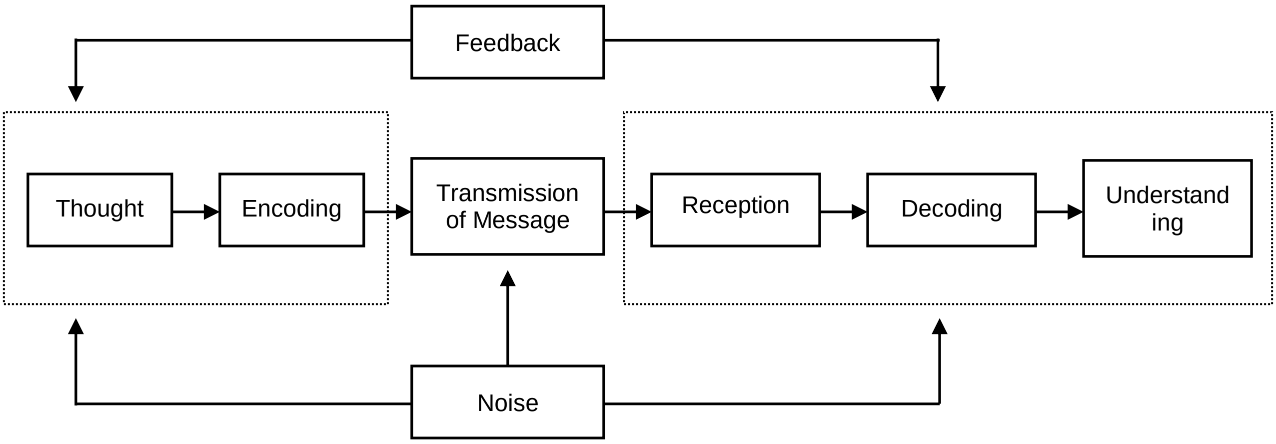

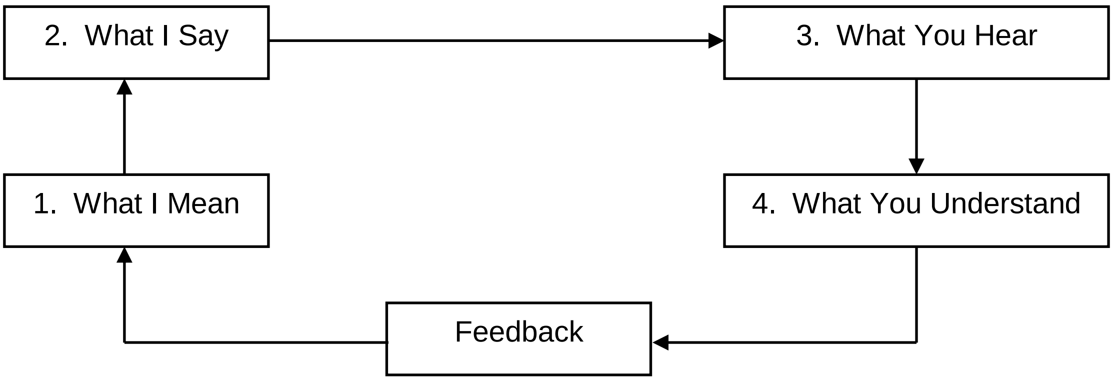

১/২ আমি যা বুঝি - আমি কি তা বলি? আমরা সবসময় নিজে যেটা বুঝি সেটা বলতে পারিনা। যেমন ঃ নিজের অনুভূতি, যার সাথে কথা বলছি তার সম্বন্ধে ধারণা, সঠিক শব্দ জানা নাই, ইত্যাদি।

২/৩ আমি যা বলি - আপনি কি শোনেন?

সব সময় আমি যেটা বলি সেটা তুমি হয়তো শোন না, যেমন ঃ অতিমাত্রায় গোলযোগের জন্য, নীচু স্বরে কথা বলার জন্য।

৩/৪ আপনি যা শোনেন - তা কি বোঝেন ?

অনেক সময় প্রাপক যা শোনে তা বুঝতে পারে না, কারণ ঃ

- □ ভাষার ভিন্নতা
- □ প্রেরক অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি কথা বলার জন্য
- □ প্রেরক সঠিক শব্দ প্রয়োগ করতে পারে না
- □ অথবা প্রেরক তথ্যটা ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনা ইত্যাদি।

প্রতিবার্তা (Feedback)

প্রেরক কিভাবে জানতে পারবে যে প্রাপক তার বার্তা বুঝতে পেরেছে ? এটা জানার একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রতিবার্তা

- প্রাপক কি করছে সেটা পর্যবেক্ষণ করা,
- প্রেরক যে তথ্য পাঠিয়েছে সেটিই প্রাপক বুঝতে পেরেছে কিনা জানার জন্য তাকে আবার তথ্যটি ব্যাখ্যা করতে বলা।

প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগের ধারা

কোন কার্যকরী প্রতিষ্ঠানে তিন ধরনের যোগাযোগ দেখা যায় ঃ নিম্নমুখী, উর্দ্ধমুখী, সমান্তরাল বা আড়াআড়ি।

১. **নিম্নমুখী যোগাযোগ**

সাধারণত উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে এই ধরনের যোগাযোগ করতে দেখা যায়।

২. **উর্দ্ধমুখী যোগাযোগ**

এই ধরনের যোগাযোগ অধীনস্ত কর্মচারীদের তাদের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ বোঝায়। উর্দ্ধমুখী যোগাযোগ সাধারণত পারস্পরিক আদান-প্রদান হয়ে থাকে এবং গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশে এ ধরনের যোগাযোগ দেখা যায়।

৩. **সমান্তরাল বা আড়াআড়ি যোগাযোগ**

এ ধরনের যোগাযোগ কোন প্রতিষ্ঠানের একই ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদার ব্যক্তিদের সাথে সরাসরি হয়ে থাকে। যেখানে ভিন্ন মর্যাদার ব্যক্তিদের সাথে সরাসরি রিপোর্ট করার বিধান নেই সেখানে এ ধরনের যোগাযোগ হয়ে থাকে। এ ধরনের যোগাযোগ পারস্পরিক সমঝোতা, সহযোগীতা বৃদ্ধি পায় যা প্রতিষ্ঠানের আকাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয়।

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ছাড়াও একধরনের অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ জমান। এটি একটি স্বাভাবিক প্রবণতা যা মানুষের একে অপরকে জানার প্রবৃত্তি থেকে সৃষ্টি

যোগাযোগে বাঁধা

যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় কতগুলি বাঁধা দেখা যায়, যেমন ঃ

- পরিকল্পনার অভাব
- বক্তা ও শ্রোতার শিক্ষা, অভিজ্ঞতার ভিন্নতা
- প্রাপকদের জন্য বোধগম্য তথ্য প্রদানে ব্যর্থতা
- মানসিক অবস্থা, বিশেষ কোন কিছু শোনার ব্যাপারে ভুল হওয়া
- ব্যক্তি সংঘাত
- ত্রুটিপূর্ণভাবে তথ্য প্রদান
- প্রেরণের সময়
- অমনোযোগীভাবে শোনা এবং অদক্ষভাবে মূল্যায়ন
- অবিশ্বাস, হুমকি, ভীতি
- অতিরিক্তি তথ্য প্রদান
- বার্তা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ভুল উপায় বা মাধ্যম নির্বাচন।

এছাড়াও, পূর্ব ধারণা এবং প্রাতিষ্ঠানিক শ্রেণীবিভাগের ব্যবধান যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি করতে পারে।

সফল যোগাযোগের জন্য নির্দেশাবলী

১. **প্রস্তুত হওয়া ঃ** কাউকে কোন তথ্য প্রদান করার আগে তথ্যটি সম্বন্ধে নিজে ভালোভাবে ধারণা করে নিতে হবে। প্রয়োজন হলে কিছু নোট লিখে রাখা যেতে পারে।

২. তথ্যটি পরিষ্কার, সহজ, সম্পূর্ণ, সঠিক হতে হবে ঃ

   (i) **পরিষ্কার ঃ** তথ্যদাতাকে নিশ্চিত হতে হবে যে তার দেয়া তথ্য ঠিকমত শোনা যাচ্ছে এবং তা যথাযথ ভাবে তিনি ব্যাখ্যা করতে পারছেন।

   (ii) **সহজ ঃ** বেশী বাক্য ব্যবহার করা উচিত নয় এতে শ্রোতা বিরক্ত অথবা দ্বিধায় ভুগতে পারে, তথ্য সব সময় সহজ সরল হওয়া উচিত।

   (iii) **সম্পূর্ণ ঃ** কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ দেয়া উচিত নয়, প্রাপকের যা যা জানা বা জানানো প্রয়োজন সেটুকুই জানানো উচিত।

   (iv) **সঠিক ঃ** প্রেরকের নিশ্চিত হতে হবে যে, সে যা বলছে তা সঠিক।

৩. **প্রতিবার্তা (*Feedback*) ঃ** তথ্য প্রদানের পর প্রতিবার্তা নিতে হবে। প্রশ্ন করে, তাদের বোঝার ক্ষমতা পরীক্ষা করে, কোন কাজ করতে দিয়ে তা পর্যবেক্ষণ করে তথ্যটি প্রাপক বুঝেছে কিনা তা জানা যায়।

৪. **প্রাপকের সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরী করা ঃ** প্রাপক যদি প্রেরককে প্রছন্দ করেন তবে তাকে বুঝতে চেষ্টা করবে এবং তিনি যা চান তাই করতে আগ্রহী হবেন।

কার্যকরীভাবে শোনা

সঠিকভাবে শোনা একটি দক্ষতা, যা আমরা অনেকেই মনে করি যে আমরা ভালো পারি। কিন্তু কোন কিছু শোনার পর যখন তার সঠিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে বা সাড়া দিতে না পারি তখন বুঝতে পারি যে শোনার ব্যাপারে নিজেদেরকে আমরা যতটা দক্ষ মনে করি আসলে ততটা না।

যে কোন ব্যবস্থাপকের তার অধীনস্ত কর্মচারীদের অনুর্ভূতি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের আপত্তি প্রভৃতি ব্যাপারে শোনার আগ্রহ থাকতে হবে। ভালোভাবে/কার্যকরীভাবে শোনা কারো জন্য সঠিক কাজ হতে পারে তবে এটা বরং প্রয়োজন যে, কার্যকরী শোনার অক্ষমতার জন্য একজন ব্যবস্থাপকের সঠিক যোগাযোগ রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আবার, সঠিকভাবে শোনা এবং অধীনস্তদের প্রতিবার্তা গ্রহণ করা যে কোন ব্যবস্থাপকের যোগাযোগের দক্ষতাকে বৃদ্ধি করে।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে শোনা গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ। শোনার প্রবণতা ব্যক্তির সাথে একটি সম্পর্ক সৃষ্টিতেও সাহায্য করে এবং যে তথ্যটি আমরা চাই সেটা সে সহজে দিতে আগ্রহী হয়।

ভালোভাবে শোনার কিছু নিয়ম

- বিষয় সম্বন্ধে আগ্রহ থাকতে হবে।
- তথ্য প্রদানের সময় বিক্ষিপ্ত বা একপেশে ব্যাপারগুলো এড়িয়ে যেতে হবে।
- আরামে বা নিশ্চিন্তভাবে শুনতে হবে।
- ঘটনা নয়, তথ্যটা জানার চেষ্টা করতে হবে।
- তথ্য প্রদানের জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে সেটা বুঝতে হবে।
- মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে।
- অপ্রয়োজনীয় বিষয় এর প্রতি দৃষ্টি না ফিরিয়ে/এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে।
- যেটা সম্বন্ধে বলা হচ্ছে সে সম্পর্কে নিজের মনে পরিষ্কার ধারণা তৈরী করতে হবে।
- নিজকে নিন্দা বা দোষারোপ করা যাবে না।
- চিন্তা শক্তির ব্যবহার করতে হবে।

যে ব্যবস্থা শুনতে মনোযোগী হতে সাহায্য করে

বলার চেয়ে শোনা অনেক তাড়াতাড়ি সম্পাদিত হয়। এজন্য একজন বক্তা যে গতিতে কথা বলেন তা অতি দ্রুত শ্রোতার মনে/উপলব্ধিতে পৌছে যায়। এ কারণ অতি সহজেই শ্রোতার মন বিক্ষিপ্ত এবং অমনোযোগী হয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া বন্ধ ঘর, বক্তার বিরক্তিকর কন্ঠস্বর, ক্লান্তি, শ্রোতাকে অমনোযোগী করে তুলতে পারে।

নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলি শ্রোতাকে কোন কিছু শুনতে মনোযোগী করতে সহায়তা করতে পারে ঃ

শ্রোতাকে নিশ্চিত হতে হবে যে, সে যার কথা শুনছে তাকে দেখতে পাচ্ছে।

- প্রজেক্টিভ শ্রবণ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। প্রজেক্টিভ শ্রবণ পদ্ধতি হচ্ছে বক্তা কোন কিছু বলার সময় তার চিন্তা, অনুভূতিকে যেভাবে ব্যক্ত করে ঠিক সেভাবেই শ্রোতা চিন্তা করার চেষ্টা করবে- সে কি বলছে, কেন বলছে।
- যদি কোন কারণে অস্বাচ্ছন্দ বোধ হয় তবে সে ব্যাপারে কিছু করা দরকার।

- নিজের আচরণ বা ধারণা কখনই যেন সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে অস্পষ্ট করে না তোলে।
- অমনোযোগী বা মন বিক্ষিপ্ত হতে পারে এমন অবস্থা থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।
- নোট লিখে রাখতে হবে।

সফলভাবে তথ্য আদান-প্রদান নিশ্চিত করার জন্য কার্যকরী যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া এই যোগাযোগেরর মাধ্যমে অধঃস্তন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাছ থেকে উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের কাছে যে তথ্য আসে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিষ্ঠানের কোথায় সমস্যা এবং এ সমস্যা সমাধান কিভাবে করা যায় এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই সবচেয়ে ভাল বলতে পারেন। তাই তাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য ও ধারণা প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিষ্ঠানটিকে কর্মতৎপর রাখতে হলে এ ধরনের যোগাযোগ সুপ্রতিষ্ঠিত করা দরকার।

হ্যান্ডআউট ৩.৩ ঃ দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা(Conflict Management)

দ্বন্দ্বের ধারণা

একটি দলে একাধিক মতের লোক থাকতে পারে। একজন কর্মী একটি পারিবারিক প্রেক্ষিত, শিক্ষা, মূল্যবোধ নিয়ে সংগঠনে সমবেত হয়। যার ফলে একাধিক ব্যক্তির মধ্যে মত ও পক্ষের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা ও চাওয়া পাওয়ার ভিন্নতা থেকেই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। সাধারণত ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দের কারণে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। দ্বন্দ্ব মানুষের আচরণে বিঘ্ন ঘটায়। এক বা একাধিক বিষয়ের প্রতি পরস্পরবিরোধী প্রতিক্রিয়া করার প্রবণতাকে দ্বন্দ্ব বলে। যে কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একাধিক লোকের মত পার্থক্যই হচ্ছে দ্বন্দ্ব।

সাধারণভাবে দ্বন্দ্বকে সময়নাশক, বিপদজনক ও সংস্থার জন্য ক্ষতিকর মনে করা হয়। কিন্তু আধুনিক ব্যবস্থাপনায় মতামত, ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যকে ইতবাচক হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ এতে বেশি যুক্তিযুক্ত মতামত ও ধারনা পাওয়া যায় এবং কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়। দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে নতুন যে বিষয়টি যুক্ত হয়েছে তাহলো সামাজিক মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে নারী কর্মীদের প্রতি পুরুষ কর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের কারণে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব। জেন্ডার ও স্বার্থ দ্বন্দ্ব সংগঠনের উন্নয়নের পথে বড় ধরনের অন্তরায় অন্যদিকে যে কোন ধরনের মত পার্থক্য নিরসন করা না গেলে তা অবশ্যই সংস্থার জন্য ক্ষতিকর।

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি / দল এর মধ্যে মতামত, ধারণা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে মত পার্থক্য বা বিরোধকে দ্বন্দ্ব বলা হয়।

কেন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় ?

একটি সংগঠনে কর্মরত কর্মীদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাপারে মত পার্থক্য থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই মতপার্থক্য যখন জটিল আকার ধারণ করে তখনই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। একটি সংস্থায় বিভিন্ন কারণে কর্মীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে। যেমন-

১. লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্ম-কৌশল সম্পর্কিত ভিন্নতার কারণে

যখন কোন সংস্থার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নীতিমালা ও কর্ম-কৌশল সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত থাকে না তখন এগুলো নিয়ে কর্মীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে। নারী কর্মীদের ব্যাপারে সংস্থার নীতিমালা ও কর্ম-কৌশল স্পষ্ট না থাকার কারণেও নারী ও পুরুষ কর্মীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে।

২. মতামত, ধারণা ও চিন্তা ভাবনার পার্থক্যের কারণে

শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, সামাজিক মূল্যবোধ ও পরিপার্শ্বিকতার কারণে একই বিষয়কে বিভিন্ন জন বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন। ফলে তাদের ধারণা, চিন্তাভাবনা ও মতামতের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, নারী ব্যবস্থাপকদের ক্ষেত্রে সমস্যাটি আরও প্রকটভাবে দেখা দেয়। সামাজিক মূল্যবোধ থেকে গড়ে ওঠা মনোভাবের কারণে পুরুষ সহকর্মীদের চিন্তা চেতনায় অনেক ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা দেয়। ফলে বিষয়টিকে তারা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন ও নারীদের বেশী/যোগ্যতার অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে, এরকম ধারণা পোষণ ও মতামত প্রকাশ করেন। যার ফলশ্রুতিতে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

৩. দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণগত পার্থক্যের কারণে

ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থেকে কোন বিষয়কে দেখার কারণে কর্মীদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে সংস্থা, উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণে সমতা আনয়নের জন্য বিশেষ নীতিমালা গ্রহণ করে। এর ফলে ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহনের সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অনেক পুরুষ সহকর্মী বিষয়টিকে সহজে মেনে নিতে পারেন না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তারা প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করেন না। যেমন একজন নারী প্রকৌশলীকে, প্রকৌশলী হিসেবে বিবেচনা করার চেয়ে নারী হিসেবে বেশী বিবেচনা করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে আচরণগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পুরুষ প্রকৌশলীকে যেখানে স্যার হিসেবে (আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক) সম্মান প্রদর্শন করছেন সেখানে একজন নারী প্রকৌশলীকে আপা হিসেবে (অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক) বিবেচনা করে ভিন্ন আচরণ করছেন বা সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করছেন। এর ফলে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হচ্ছে।

৪. প্রত্যাশার পার্থক্যের কারণে

বৈশিষ্ট্যগত কারণে কর্মীদের মধ্যে প্রত্যাশার ভিন্নতা দেখা যায়। আবার অবস্থানগত কারণের প্রত্যাশা ভিন্ন হয়। উঁচুস্তরের ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে যে ব্যক্তি রয়েছেন নিম্নস্তরের কর্মীর চেয়ে তার প্রত্যাশা ভিন্ন, দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। এতে কর্ম সম্পাদনের দ্বন্দ্ব হয়। যেমন প্রশাসন প্রত্যাশা করে একজন নারী কর্মী তার পুরুষ সহকর্মীদের মতই মোটর সাইকেল চালাবে, ফিল্ডে ট্যুর করবে ইত্যাদি। কিন্তু নারী কর্মীদের প্রত্যাশা হচ্ছে প্রশাসন, পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত দেবে। কারণ ব্যক্তিগতভাবে একজন নারী কর্মীর ইচ্ছা থাকলেও পারিপার্শ্বিকতা এবং তার ত্রিমাত্রিক ভূমিকার কারণে তার পক্ষে সর্বক্ষেত্রে একজন পুরুষের সমান ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়। এ ধরনের আরও অনেক প্রত্যাশাগত পার্থক্যের কারণে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

৫. যোগাযোগ এর ক্ষেত্রে গ্যাপ এর কারণে

কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে যোগাযোগ একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া। কিন্তু এই যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় ত্রুটি বা গ্যাপ দেখা দিলে কর্মী/ব্যবস্থাপকদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। ভুল তথ্য সরবরাহ, তথ্যের বিকৃতি, সময়মতো তথ্য সঞ্চালন না হওয়া ইত্যাদি গ্যাপ এর কারণে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। সংগঠনে যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় গ্যাপ চলমান থাকলে এক সময়ে তা দ্বন্দ্বের রূপ ধারণ করে।

৬. ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিক ত্রুটি ও জটিলতার কারণে

যে কোন সংগঠন ও এর ব্যবস্থাপনা একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া উচিত। কিন্তু অধিকাংশ সংস্থার কোন নীতিমালা থাকে না। আবার যেসব সংগঠনে নীতিমালা আছে তা ত্রুটিপূর্ণ বা জটিল অথবা সঠিকভাবে অনুসরন করা হয় না। জেন্ডার বান্ধব কর্ম পরিবেশের জন্য কোন নীতিমালা না থাকায় অনেক সময় জটিলতার সৃষ্টি হয়।

৭. ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কারণে

যে কোন সংগঠনে দলীয় সংহতি (টীম স্পিরিট) না থাকলে সুষ্ঠু কর্ম সম্পাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। কর্মীরা একক বা বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করলে সংস্থার উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব নয়, সেজন্য প্রয়োজন দলীয় গতিশীলতা। কিন্তু অনেক সময় বিভিন্ন কারণে কর্মীর মধ্যে সংস্থার প্রতি কমিটমেন্ট কমে গিয়ে ব্যক্তি স্বার্থ দেখা দেয়। আবার অনেক কর্মীদের মধ্যে ব্যক্তিগত / দলীয় বা বিভাগীয় মত পার্থক্য / বিরোধ দ্বন্দ্বের আকার ধারণ করে। অনেক সময় সুপারভাইজারগণ দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তি বা দলীয় আক্রোশের শিকার হন। এ ধরণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিরোধ নিরসন করা না গেলে তা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে।

৮. কর্মীরা নিজ নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন না করার কারণে

সংগঠনের প্রত্যেক কর্মীর একটা কর্ম-বিবরণী বা দায়িত্ব থাকে। প্রত্যেকে স্ব-স্ব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার মধ্য দিয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সংস্থার উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব হয়। কিন্তু অনেক সময় কোন কোন কর্মী নিজ দায়িত্বের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে, যা অন্যদের কাজকে প্রভাবিত করে। আবার অনেক সময় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোন কর্মী দায়িত্বের প্রতি কম গুরুত্ব প্রদান করায় দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সুপারভাইজারগণ অনেক সময় সহায়ক সেবা (সাপোর্ট সার্ভিস) প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হন। ব্যবস্থাপক এর কাছে তার কাজটি গুরুত্বহীন হয়ে যায়। প্রশাসনিক দূর্বলতার কারণে কর্মীর দায়িত্বে নিষ্ঠতার অভাব অনেক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে।

দ্বন্দ্ব নিরসনের উপায়সমূহ

দ্বন্দ্ব নিরসনের কয়েকটি উপায় বা পদ্ধতি রয়েছে, তবে কোন পদ্ধতি সকল ব্যক্তি বা অবস্থার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। কোন পদ্ধতি কখন কার্যকরী হবে তা নির্ভর করে পরিস্থিতি এবং সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের উপর। দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য একজন ব্যবস্থাপকের বিকল্প ব্যবস্থাসমূহ জানা থাকা প্রয়োজন, তাহলে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে তিনি অধিক পারদর্শী হবেন।

দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য নিম্নলিখিত এক বা একাধিক উপায়সমূহ অবলম্বন করা যেতে পারে-

(১) সমস্যা থেকে নিজেকে দূরে রাখা বা প্রত্যাহার করা

কথায় বলে "এক হাতে তালি বাজে না"। দ্বন্দ্বের জন্য একপক্ষ পুরাপুরি দায়ী থাকে না। তাই দ্বন্দ্ব নিরসনে আগ্রহী হলে প্রথম যে কাজটি করা যেতে পারে তাহলো, যে কারণে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে সেই বিষয় বা ঘটনা থেকে নিজেকে দূরে রাখা। দ্বিতীয়তঃ কোন বিষয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে নিজের ভুল স্বীকার করে বা দুঃখ প্রকাশ করে নিজেকে প্রত্যাহার করা। অনেকেই এটাকে ছোট হওয়ার ব্যাপার মনে করতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতে নিজের গ্রহণযোগ্যতা আরও বাড়িয়ে দেবে।

(২) সকলের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা

"যারে দেখতে নারী তার চলন বাঁকা" কথাটি দ্বন্দ্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে খুব বেশী প্রযোজ্য। আপনার সাথে যদি আপনার সুপারভাইজার বা সহকর্মীর কর্ম সম্পর্ক ভাল থাকে তাহলে আপনার অনেক ত্রুটিই তারা বড় করে দেখবেন না। অন্যদিকে সম্পর্ক ভাল না থাকার কারণে অনেক ছোট খাটো ত্রুটি অনেক বড় হিসেবে বিবেচিত হবে, যার ফলশ্রুতিতে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হবে।

(৩) সমস্যাকে ব্যক্তিগতভাবে না নেয়া

দ্বন্দ্ব সৃষ্টির একটি বড় কারণ হলো অনেক সময় আমরা মত পার্থক্যকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে নিই। সংগঠনে কাজ করার ক্ষেত্রে আদর্শগত বা কর্ম-কৌশল সম্পর্কিত মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। এই মতবিরোধ এর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত আক্রোশ বা প্রতিহিংসা দ্বন্দ্ব নিরসনের পক্ষে প্রধান অন্তরায় হিসেবে দেখা দেয়। তাই দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য সকলের উচিত কোন সমস্যাকে ব্যক্তিগতভাবে না

নেওয়া। ব্যবস্থাপকগণ কোন সমস্যাকে ব্যক্তিগত সমস্যা হিসেবে মোকাবেলা করার চেষ্টা না করে যদি ব্যবস্থাপকদের সমস্যা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার যুক্তি প্রদর্শন করেন তাহলে ব্যক্তিগত আক্রোশ এড়ানো এবং অন্যদের সহযোগীতা পাওয়া সহজ হবে।

(৪) ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটানো

অনেক সময় যোগাযোগের গ্যাপ বা সামান্য ভুল বোঝাবুঝির থেকে বড় ধরনের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে উভয় পক্ষের উচিত এই ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটানো। অনেক ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষ কোন স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে তথ্য বিকৃত বা অতিরঞ্জিত করে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে দেয়। তাই সব সময় উচিত দ্বন্দ্বের কারণ বিশ্লেষণ করা । অনেক ক্ষেত্রে এরূপ পরিস্থিতিতে তৃতীয় পক্ষকে মধ্যস্ততার ভূমিকা পালনের জন্য এগিয়ে আসা উচিত।

(৫) সমস্যার শুরুতেই মুখোমুখি হওয়া

অনেক সময় সমস্যা দীর্ঘায়িত হলে এটি জটিল আকার ধারণ করে এবং তখন তা সহজে সমাধান করা যায় না। তাই সব সময় কোন প্রকার দ্বন্দ্ব দেখা দিলে ব্যবস্থাপক/প্রশাসনের কর্তব্য হবে যথাশীঘ্র তা নিরসন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। সমস্যাকে কখনও এড়ানোর (ওভার লুক) চেষ্টা করা ঠিক নয়। শুরুতেই এর মুখোমুখি হলে বড় ধরনের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই তা নিরসন করা সম্ভব হয়।

(৬) আপোষ মীমাংসার জন্য আলাপ-আলোচনা করা

সংস্থায় বা কর্মীদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব দেখা দিলে ব্যবস্থাপনা/প্রশাসন এর উচিত হবে তা নিরসনের জন্য খোলাখুলি আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করা। এতে অনেক ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়। যুক্তিতর্কের মাধ্যমে আপোষ মীমাংসা সহজতর হয়। ফলে দ্বন্দ্ব এড়ানো সম্ভব হয়।

(৭) মীমাংসার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করা (দ্বন্দ্ব নিরসনের শেষ উপায়)

মনে রাখতে হবে এটি দ্বন্দ্ব নিরসনের শেষ উপায়, সংস্থার বৃহত্তম স্বার্থে চলমান থাকতে দেয়া উচিত নয়। এর অবশ্যই নিরসন করা প্রয়োজন। সব উদ্যোগ ব্যর্থ হলে প্রশাসনের উচিত হবে দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য সংস্থার নীতিমালার আলোকে ক্ষমতার প্রয়োগ করা। সংস্থার স্বার্থে প্রয়োজনে যে কোন কঠোর সিদ্ধান্ত/ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কারণ দ্বন্দ্ব স্থায়ী হলে সংস্থার কর্ম পরিবেশ ও কর্মীদের সম্পর্ক নষ্ট হয়, সর্বোপরি সংস্থার কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, সংস্থার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সুষ্ঠু কর্ম-পরিবেশ এবং কর্মীদের পারস্পরিক সু-সম্পর্ক বজায় রাখা অপরিহার্য। দ্বন্দ্ব এক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে। তাই কোন প্রকার দ্বন্দ্ব স্থায়ীত্ব লাভ করতে থাকলে তা নিরসনের জন্য এর কারণ, সামাজিক পরিস্থিতি ও কর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

দ্বন্দ্বকে আয়ত্তে রাখার জন্য দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সাংগঠনিক দ্বন্দ্বের ফলাফল(Consequences of Organizational Conflict)

অতীতে ধারণা করা হতো সকল ধরনের দ্বন্দ্বই ক্ষতিকর। তবে বর্তমানে বিশ্বাস করা হয় যে, দ্বন্দ্ব সর্বদা নেতিবাচক ফলাফল বহন করে না। দ্বন্দ্ব কখনও কখনও নেতিবাচক আবার কখনও কখনও ইতিবাচক ফলাফল বহন করে। এছাড়া, দ্বন্দ্বের ফলে কোন নির্দিষ্ট পক্ষ উপকৃত হতে পারে না উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্থ বা উভয় পক্ষই লাভবান হতে পারে। সৃজনশীল দ্বন্দ্বের ফলে প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি বা দল সকল পক্ষই উপকৃত হতে পারে।

দ্বন্দ্বের ফলাফল সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন দৃষ্টিকোন হতে বিশ্লেষণ করেছেন। দ্বন্দ্বের ফলাফল সম্পর্কে সর্বজন গৃহীত একজন লেখকের আলোচনা তুলে ধরা হলো ঃ

খ.Schmidtএর দৃষ্টিভঙ্গি

Schmidtতার এক গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে দ্বন্দ্বের ফলাফলকে দু'ভাগে ভাগ করেছে (i) ইতিবাচক ফলাফল ও (ii) নেতিবাচক ফলাফল।

(i) ইতিবাচক ফলাফল (Positive Effects)ঃ

১. উন্নত ধারণা *(High Impression)*ঃ সংগঠনে দ্বন্দ্বে লিপ্ত পক্ষসমূহ সর্বদা জয়ী হতে চায়, তারা অপর পক্ষের তুলনায় নিজেদেরকে সর্বদা উচ্চ ও উন্নত অবস্থানে দেখতে পছন্দ করে, ফলে তারা সফলতার বাহন হিসেবে প্রচলিত ধারণার পরিবর্তে কর্মক্ষেত্রে উন্নত ধারণার প্রবর্তন করে। ফলে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে এবং সংগঠন এর সুফল ভোগ করে।

২. নতুন দৃষ্টিভঙ্গি *(New outlook)* ঃ যেহেতু দ্বন্দ্বকারীরা সর্বদা অপর পক্ষের তুলনায় ভিন্ন মতামত প্রদানে আগ্রহী হয় ফলে প্রত্যেক দ্বন্দ্বের বিষয়বস্তু সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অবতারণা করার প্রয়াশ চালায়।

৩. দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের উদ্যোগ (*Efforts to make a long term solution*) ঃ দ্বন্দ্ব সংগঠিত না হলে কর্মীরা সহিষ্ণুতার কারণে তাদের অসন্তুষ্টির কথা চেপে যায়। ফলে এরূপ ছোট ছোট কর্মী অসন্তুষ্টি একত্রে বিরাট বিশৃঙ্খলায় রূপ নিতে পারে। তাই বিজ্ঞজনেরা মনে করেন ছোটখাট দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হলে প্রতিষ্ঠানের ও কর্মীদের সমস্যা সমাধান তৃরান্বিত হয়। কারণ সংগঠন এরূপ দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ ভবিষ্যৎ সমস্যা এড়াতে এর স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপন্থা গ্রহণ করে।

৪. সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা (*Clear Explanation*) ঃ সংগঠনের কোন আন্তঃসম্পর্কিত বিষয়ে বিভিন্ন পক্ষ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তারা প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব মতামতের মাধ্যমে উক্ত বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা তুলে ধরে, ফলে যুক্তি তর্কের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত বিষয়ে সকলে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করে। ফলে দ্বন্দ্ব সমাধানের পথ সুযোগ হয়।

৫. সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাকরণ (*Making creativity*) ঃ দ্বন্দ্ব সর্বদা সংঘাতের সৃষ্টি করে তা নয়। বরং এটি কখনও কখনও কর্মীদের সৃজনশীল হতে সাহায্য করে। ফলে কর্মীদের সৃজনশীল চিন্তাভাবনা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ব্যবহার করা যায়।

৬. সামর্থের যাচাই (*Checking ability*)ঃ দ্বন্দ্ব কর্মীদের সামর্থ্য যাচাইয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। ব্যবস্থাপকগণ কর্মীদের সামর্থ্য যাচাইয়ের জন্য কখনও কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে কর্মীদের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে দেয়। এরূপ দ্বন্দ্বের ফলে ব্যবস্থাপক কর্মীদের সৃজনশীলতা, দক্ষতা, প্রত্যক্ষণ, নেতৃত্ব ইত্যাদি যাচাই করতে পারে।

(ii) নেতিবাচক ফলাফল (Positive Effects) ঃ

১. পরাজয়ের গ্লানি (*Feeling of defeat*) ঃ দ্বন্দ্বের ফলে কোন কোন ব্যক্তি কিছুটা প্রাধান্য পায় আবার কেউ কেউ অবহেলার সম্মুখীন হন, এছাড়া পারস্পরিক সমঝোতার সময় কোন কোন ব্যক্তি নিজেকে পরাজিত মনে করেন এবং অপমানবোধে ভুগতে থাকেন। ফলে তাদের সৃজনশীলতা হ্রাস পায় এবং কর্ম অসন্তুষ্টি দেখা দেয়।

২. দূরত্ব বৃদ্ধি (*Increase of distance*) ঃ দ্বন্দ্ব একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়, এটি কর্মীদের মাঝে মানসিক দূরত্ব বৃদ্ধি করে। ফলে পারস্পরিক সহযোগিতা হ্রাস পায়। এছাড়া দ্বন্দ্ব ব্যক্তিগত পর্যায়ে রূপ নিলে তা বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়াতে পারে। দলগত প্রচেষ্টায় মানসিক দূরত্ব বৃদ্ধি পেলে পারস্পরিক সমাঝোতা হ্রাস পায়। এতে দলগত উৎপাদনশীলতা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

৩. সন্দেহ ও আস্থাহীনতা (*Suspicion and lack of confidence*) ঃ দ্বন্দ্বের ফলে কর্মীদের মাঝে আস্থাহীনতা এবং সন্দেহের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে কর্মীরা একে অন্যের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের মাঝে মারমুখী পরিবেশ বিরাজ করে। ফলে কর্ম পরিবেশে অস্থীতিশীলতা দেখা দেয় এবং কর্মীর উৎপাদনশীলতা বহুলাংশে হ্রাস পায়।

৪. শ্রম ঘূর্ণায়মানতা (*Labour turnovers*) ঃ দীর্ঘদিন একটি সংগঠনে দ্বন্দ্ব বিরাজ করলে কর্মীদের মাঝে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। নতুন কর্মীরা এরূপ পরিবেশে খাপ খাওয়াতে পারে না। শান্তিপ্রিয় কর্মীরা এরূপ পরিবেশ গ্রহণ করতে পারে না। দ্বন্দ্বে লিপ্ত কর্মীরা এ ধরনের পরিস্থিতি হতে পরিত্রান পেতে চায়। ফলে সকল কর্মী সর্বদা ভালো সুযোগের অপেক্ষায় থাকে এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে চলে যায়। ফলে সংগঠনে শ্রম ঘূর্নায়মানতা বেড়ে যায় এবং দক্ষ কর্মীর সংকট দেখা দেয়।

৫. দলগত প্রচেষ্টার বিফলতা (*Failure in group effort*) ঃ অধিকাংশ দলগত প্রচেষ্টার বিফলতার কারণ চিহ্নিত করলে দেখা যায় যে, দ্বন্দ্বই হচ্ছে এর মূল কারণ। দ্বন্দ্বের কারণে যৌথভাবে কার্য সম্পাদনের মনোভাব তিরোহিত হয়ে অন্যের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টির মনোভাব বৃদ্ধি পায়। একটি পক্ষ অন্য পক্ষের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হয়, ফলে তাদের মাঝে আক্রমাণাত্বক মনোভাবের জন্ম নেয়।

৬. হীনস্বার্থ (*Malafied intention*) ঃ দ্বন্দ্বের ফলে প্রতিটি দলের মধ্যে কয়েকটি উপদলের জন্ম হয়। এ সকল উপাদানগুলো নিজেদের দলগত ও ব্যক্তিগত হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কখনও কখনও কুট কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে । বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান রহিত করে এবং পারস্পরিক সহযোগিতায় বাধা সৃষ্টি করে।

হ্যান্ডআউট ৩.৪ ঃ কর্মী পরামর্শ(Employee Counseling)

কর্মীদের স্বতঃস্ফুর্ত কাজ করার উপরই একটি প্রতিষ্ঠানের গতি ও উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে। কেননা শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মানুষের আচার আচরণ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা ও কার্য প্রক্রিয়ায় সরাসরি প্রভাবিত করে। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাকে কর্মীদের আচরণের প্রতি খুব সতর্ক নজর রাখতে হয়। বিশেষত কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য যে পরামর্শ দেয়া হয় তাকে কর্মী পরামর্শ বলে।

কর্মরত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যার সাথে ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য কর্মীদের প্রয়োজনীয় উপদেশ-নির্দেশ দ্বারা সহায়তা করাকে কর্মী পরামর্শ বলে।

সচরাচর আবেগজনিত বিষয় সফলতার সাথে আয়ত্ত করতে সহায়তা করার জন্য কর্মীর সাথে আলোচনা করাকে পরামর্শ দান বলে।

কর্মী পরামর্শ বলতে আমরা বুঝি-

১. সংগঠনে নিয়োজিত কর্মীদের আবেগজনিত সমস্যা নিয়ে কাজ করা,
২. প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থা দূর করা,
৩. সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্টদের সাথে ভাবের আদান-প্রদান করা,
৪. পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ-খাওয়ানোর মানসিক অবস্থা তৈরী করা।

মূলত কর্মী পরামর্শ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শের ব্যবস্থা করা। প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, উৎপাদনের গতি ও মান বজায় রাখার জন্য কর্মরত কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা মনোচিকিৎসক দ্বারা প্রদত্ত পরামর্শই কর্মী পরামর্শ।

কর্মী পরামর্শের উদ্দেশ্য(*Objectives of Counseling*)

নিম্নে কর্মী পরামর্শের উদ্দেশ্য আলোচনা করা হলো ঃ

১. যথাযথ কর্মী নির্বাচন ঃ কর্মী পরামর্শের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত কাজের জন্য উপযুক্ত কর্মী নির্বাচন করা সম্ভব হয়। বিশেষত অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে পদোন্নতি বা শূণ্য পদে লোক নিয়োগে যে কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্মী পরামর্শ বিশেষ ভূমিকা রাখে। বিশেষত যেসব পদের মানুষ মানসিক শ্রমের সাথে যুক্ত তাদের মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচন করা অত্যন্ত জরুরী।

২. আবেগ নিয়ন্ত্রণ ঃ আবেগ ও যুক্তির ভারসাম্য অবস্থার মধ্য দিয়ে একজন কর্মীকে প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে কর্মীরা বেয়াড়া ধরণের বা অবিনীত আচরণ করে থাকে। আবার উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষও কর্মীদের সাথে যথাযথ আচরণ করে থাকেন না। তাই কোন কারণে একজন কর্মী আবেগতাড়িত হয়ে পড়লে কর্মী পরামর্শের মাধ্যমে তার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এতে প্রতিষ্ঠানে অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় না।

৩. দক্ষতা বৃদ্ধি ঃ একজন কর্মীর কাজে ভুলত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্মীকে ভুল সংশোধনের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে একজন অদক্ষ কর্মীকে দক্ষ কর্মীতে পরিণত করতে পারে। কর্মী পরামর্শ কর্মীকে সঠিকভাবে কার্য সম্পাদনের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকে।

৪. পেশাগত মূল্যায়ন ঃ কর্মী মূল্যায়ন একটি গতিশীল প্রতিষ্ঠানের জন্য একান্ত অপরিহার্য। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে পূর্ব নির্ধারিত পদ্ধতির অভাবে কর্মীকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে পারে না। এক্ষেত্রে কর্মী পরামর্শ কর্মী মূল্যায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

৫. দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনঃ একজন কর্মী কার্যক্ষেত্রে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিচালিত হয়। কর্মীটি সংকীর্ণ ও কুসংস্কার আচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন হলে কর্মী পরামর্শ তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে পারে। সাংগঠনিক উন্নয়নের জন্য দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন একান্তভাবে অপরিহার্য। মানুষকে সংকীর্ণ দৃষ্টিকোন থেকে উত্তম দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন করে তোলাই কর্মী পরামর্শের উদ্দেশ্য।

৬. পরিবেশ উন্নয়নঃ প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিবেশ যান্ত্রিক উপাদানের চেয়ে মানবিক উপাদান দিয়ে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত। অর্থাৎ কর্মীরাই প্রতিষ্ঠানের পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে। কর্মী পরামর্শ এক্ষেত্রে কাজের পরিবেশ উন্নয়নের জন্য কর্মীদেরকে প্রভাবিত করতে পারে। কর্মীদের মনোভাব অনুকূলে এনে কার্য পরিবেশ উন্নত করাই এর উদ্দেশ্য।

৭. ব্যক্তিগত গবেষণাঃ একজন ব্যক্তি হিসাবে একজম কর্মী তার পরিবার ও সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে। সে তার পরিবার ও সমাজের মূল্যবোধকে ধারণ করে এবং সে মূল্যবোধ দ্বারা চালিত হয়। যখন কর্মী প্রতিষ্ঠানের মূল্যবোধের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে ব্যর্থ হয় তখন কর্মী পরামর্শ তাকে সামঞ্জস্য বিধানে সাহায্য করে।

৮. উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিঃ হতাশাগ্রস্ত কর্মী স্বাভাবিক কারণে একটি প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতাকে ব্যহত করে। এই ক্ষেত্রে কর্মী পরামর্শ ব্যক্তির সমস্যাগুলো দূর করে তার কর্ম সন্তুষ্টিকে বাড়িয়ে দিতে পারে। ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। শ্রম শক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করাও কর্মী পরামর্শের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য।

৯. কর্মীর অসন্তোষ হ্রাসঃ কর্মী পরামর্শের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সবসময়ই কর্মীদের পাশাপাশি থাকে বলে হঠাৎ করে প্রতিষ্ঠানে কোন বড় ধরনের কর্মী অসন্তোষ দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকে না। পরামর্শক কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও পরামর্শ দিয়ে কর্মী অসন্তোষকে স্থিমিত করে। কর্মীদের মধ্যকার ক্ষোভ বা হতাশার কারণগুলো জেনে নিয়ে তা সমাধানের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকে।

১০. কর্ম সন্তুষ্টিঃ কর্মীদের সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি আদায়ের ক্ষেত্রে কর্মী পরামর্শের ভূমিকা অপরিহার্য। কর্মীরা কিভাবে কাজে উৎসাহিত হবে, তাদের স্নায়ুর চাপ কতটুকু এবং তাদের হতাশার পরিমান কত ইত্যাদি, জেনে কর্মী ও কর্তৃপক্ষকে সমস্যা দূর করার পরামর্শ দিয়ে থাকে। এতে কর্মীরা সন্তুষ্ট থাকে।

১১. মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নঃ কর্মীদের মানসিক অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা নির্ভর করে। কর্মী পরামর্শের মাধ্যমে কর্মীদের মানসিক অবস্থা বিকশিত হয়।

১২. আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিঃ আত্মবিশ্বাস একটি মনোবল বৃদ্ধিকরণ উপাদান। আত্মবিশ্বাসহীন কর্মী সংগঠনের লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয় না। তাই পরামর্শ দানের মাধ্যমে কর্মীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা সহজ হয়। ফলে কর্মী দক্ষতার সাথে কার্য সম্পাদনে সক্ষম হয়। এতে প্রতিষ্ঠান উন্নত কর্মী সেবা লাভের সুযোগ পায় এবং উপকৃত হয়।

পরামর্শদানের কৌশল

প্রতিষ্ঠানের যেমন ভিন্নতা রয়েছে তেমনি কর্মী পরামর্শেরও ভিন্নতা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের মানসিক সমস্যা দূর করবার জন্য কর্মী পরামর্শ চালু করা হয়। অবশ্য প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের মানসিক সমস্যার ধরন, কর্মক্ষমতা, প্রতিষ্ঠানের কাজের প্রকৃতি ও উৎপাদনশীলতার উপর নির্ভর করেই একটি প্রতিষ্ঠান তার কর্মীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শের ব্যবস্থা করে থাকেন। তবে বিভিন্ন লেখক প্রতিষ্ঠানে পরামর্শ গ্রহীতাকে কিভাবে নির্দেশনা দেন তার উপর ভিত্তি করে পরামর্শদানের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। এ দৃষ্টিকোন থেকে পরামর্শ প্রদানের কৌশলকে নিম্নোক্ত তিনভাবে ভাগ করা হয়। যেমন-

১. নির্দেশনামূলক পরামর্শ *(Directive Counseling)*
২. অনির্দেশনামূলক পরামর্শ *(Non Directive Counseling)*
৩. অংশগ্রহণমূলক পরামর্শ *(Participative Counseling)*

নিম্নে এসব কৌশলসমূহ আলোচনা করা হলো ঃ

১. নির্দেশনামূলক পরামর্শ *(Directive Counseling)* ঃ এ ধরনের পরামর্শে কর্মীদের মানসিক সমস্যা কিংবা আবেগজনিত সমস্যা দূরীকরণের জন্য পরামর্শের মাধ্যমে নির্দেশ দেয়া হয়। আর নির্দেশ দেয়া হয় বলে এ ধরনের পরামর্শকে নির্দেশনামূলক পরামর্শ বলে। এ ধরনের পরামর্শ অনেকটা কর্তৃত্বব্যঞ্জকও বটে। নির্দেশনামূলক পরামর্শ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে কর্মীদের সমস্যা শোনা হয়, তাদের করণীয় নির্ধারণ করা হয় এবং নির্দেশনা অনুসরণের জন্য প্ররোচিত করা হয়।

এ ধরনের পরামর্শদানের ক্ষেত্রে পরামর্শদাতা প্রথমেই পরামর্শগ্রহীতার সমস্যাবলী ধৈর্য্য সহকারে শোনেন। শোনার পর সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং সমাধানের লক্ষ্যে কর্মীকে নির্দেশনা দান করেন এবং লক্ষ্য অর্জনের পথ প্রদর্শন করেন। এক্ষেত্রে অবশ্যই ধরে নেয়া হয় যে পরামর্শদাতা অবশ্যই পরামর্শ গ্রহীতার চেয়ে অধিক জ্ঞানের অধিকারী এবং সমস্যা সমাধানের বিষয়ে তার সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে। এ ধরণের পরামর্শ প্রদান একটি গতানুগতিক পদ্ধতিও বটে। এ ধরণের পরামর্শ উপদেশমূলক হলেও এটি পুনঃনিশ্চয়তা দান, যোগাযোগ, আবেগজনিত অবস্থা দূর এবং বিশোধন সংক্রান্ত কার্যাবলীও সমাধা করে থাকে।

২. অনির্দেশনামূলক পরামর্শ *(Non Directive Counseling)* ঃ অনির্দেশনামূলক পরামর্শদান পদ্ধতি মূলত পরামর্শগ্রহীতাকেন্দ্রিক। এ পদ্ধতিতে পরামর্শদাতা কর্মীকে সরাসরি কোনরূপ উপদেশ বা নির্দেশ দেন না। পরামর্শদাতা মনোযোগ দিয়ে কর্মীর কথা শুনে থাকেন, তার আবেগজনিত সমস্যা প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করেন। এ পদ্ধতিতে পরামর্শদাতার পরিবর্তে কর্মী অর্থাৎ যিনি পরামর্শ গ্রহণ করবেন তাকেই বিচারক হিসেবে দাঁড় করানো হয়।

অনির্দেশনামূলক পরামর্শ হলো নির্দেশনামূলক পরামর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। এক্ষেত্রে পরামর্শদাতার ভূমিকা হলো পরামর্শ গ্রহীতার (কর্মীর) বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা, তার অনুভূতি সঠিকভাবে অনুধাবন করা এবং কর্মীকে তার উদ্দেশ্য অর্জনের পথ বেছে নিতে অনুপ্রাণিত করা। এক্ষেত্রে পরামর্শদাতা তার নিজস্ব কোন অভিব্যক্তি প্রকাশ করে না। সাধারণত পেশাদার পরামর্শদাতা কর্তৃক অনির্দেশনামূলক পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে।

৩. সহযোগীতামূলক বা অংশগ্রহণমূলক পরামর্শ *(Participative Counseling)*ঃ নির্দেশনামূলক পরামর্শদান ও অনির্দেশনামূলক পরামর্শদান পদ্ধতি দুটি সম্পুর্ণ বিপরীতধর্মী। নির্দেশনামূলক পরামর্শদান পদ্ধতি ব্যবহার করা যেমন বেশির ভাগ সময়ই সম্ভব হয় না আবার অনির্দেশনামূলক পরামর্শদান পদ্ধতিও কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। এ সমস্যা হতে পরিত্রানের লক্ষ্যে সহযোগিতামূলক বা অংশগ্রহণমূলক পরামর্শদান পদ্ধতি নামে তৃতীয় একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। অংশগ্রহণমূলক পরামর্শ নির্দেশমূলক ও অনির্দেশমূলক পরামর্শদান পদ্ধতির সমন্বয়ে গঠিত।এ পদ্ধতি নির্দেশমূলক ও অনির্দেশমূলক পরামর্শদান পদ্ধতির সুবিধাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত। অংশগ্রহণ পরামর্শদান পদ্ধতিতে পরামর্শদাতা ও পরামর্শ গ্রহণকারী দু'জনের অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে সমস্যা সমাধানের পথ আবিষ্কার করা হয়।

অংশগ্রহণমূলক পরামর্শদান কর্মীর কথা শোনার মধ্যে দিয়ে শুরু হয়। পরে পরামর্শদাতা কর্মীর সাথে আলোচনায় অংশ নেন এবং নিজের চিন্তাভাবনা, অভিজ্ঞতা কর্মীর সামনে উপস্থাপন করেন। এতে কর্মী বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন পরিস্থিতির তুলনামূলক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সুযোগ পায়।

অংশগ্রহণমূলক পরামর্শে পুনঃনিশ্চয়তাদান, যোগাযোগ, মানসিক অস্থিরতা দূরীকরণ এবং বিশোধন চিন্তাভাবনা এ চারটি কাজ সম্পন্ন হয়। এ পদ্ধতিতে সরাসরি কোন উপদেশ বা নির্দেশ দেয়া হয় না। কর্মীর মানসিক পরিস্থিতি পূর্বাবস্থায় আনতে হলে তাকে পেশাদার পরামর্শদাতার নিকট পাঠানো হয়।

অংশগ্রহণমূলক পরামর্শদান কাজটি অপেশাদার পরামর্শদাতার মাধ্যমেও করা যায়, কিন্তু তিনি নির্দেশনামূলক পরামর্শদানে কর্তৃত্বমূলক ভূমিকা পালন করেন না। কিছু কিছু ক্ষেত্র ছাড়া প্রায় সকল পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক পরামর্শদান পদ্ধতিতে সফলতার মাত্রা বেশি। এ পদ্ধতিতে কর্মীরা তাদের সমস্যা, মনোভাব মন খুলে ব্যক্ত করতে পারে।

অধ্যায় চার ঃ কর্ম সম্পাদন ব্যবস্থাপনা
(Performance Management)

- অধিবেশন ৪.১ ঃ কর্ম সম্পাদন মূল্যায়ণ (Performance Appraisal)

- অধিবেশন ৪.২ ঃ সরকারী কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপীল বিধিমালা এবং সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধিমালা

- অধিবেশন ৪.৩ ঃ পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ণ **(Monitoring & Evaluation)**

- অধিবেশন ৪.৪ ঃ আর্থিক ব্যবস্থাপনা**(Financial Management)**
  - ৪.৪.১ঃ আর্থিক ব্যবস্থাপনাঃ হিসাব বিজ্ঞান **(Accounting)**
  - ৪.৪.২ঃ বাজেট **(Budget**) ও অডিট **(Audit)**

- অধিবেশন ৪.৫ ঃ জেন্ডার এবং উন্নয়ন **(Gender and Development)**
  - ৪.৫.১ঃ জেন্ডার এর ধারণা ও ইস্যুসমূহ
  - ৪.৫.২ঃ কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা
  - ৪.৫.৩ঃ জেন্ডার বান্ধব কর্মক্ষেত্র

হ্যান্ডআউট ৪.১ ঃ কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন(Performance Appraisal)

ধারণা

কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের যোগ্যতা ও দক্ষতা যাচাই করার পদ্ধতিকে কর্ম সম্পাদন মূল্যায়ন বলে। বস্তুগত ও গুণগত উপাদানগুলো মূল্যায়নের মাধ্যমে কর্মীর যোগ্যাতা যাচাই করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এ প্রক্রিয়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে একজন কর্মী তার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য কিরূপে সম্পাদন করছে তা নির্ণয় করা যায়।

একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদল তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য কতটুকু নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করছে তা উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়মতান্ত্রিকভাবে নির্ণয় করার প্রক্রিয়া হলো কর্ম সম্পাদন মূল্যায়ন।

কর্ম সম্পাদন মূল্যায়নের মাধ্যমে কাজের পরিমাণের প্রকৃত সম্পাদন ও প্রত্যাশিত কাজের তুলনা করে বিচ্যুতির (gap) পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। অতঃপর প্রয়োজনে নির্ধারিত লক্ষ্য বা কর্মীর কর্ম তৎপরতার পরিবর্তন আনয়নের ব্যবস্থা করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় কর্মীদেরকে তাদের অবস্থান সম্বন্ধে জানানো হয় এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করা হয়।

কর্ম সম্পাদন মূল্যায়নের গুরুত্ব
(Importance of Performance Appraisal)

ধারাবাহিক ও নিরপেক্ষ কর্ম সম্পাদন মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠান ও এর কর্মীদল উভয়ের উন্নয়নের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে যেমন জানা প্রয়োজন কোন কর্মী অত্যন্ত প্রতিভাবান, কোন কোন কর্মী যোগ্য ও দক্ষ, কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বলতা রয়েছে এবং কোন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন, তেমনি কর্মীদেরও তাদের অবস্থান সম্বন্ধে ধারণা হওয়া দরকার।

কর্ম সম্পাদন মূল্যায়নের ফলে প্রতিষ্ঠান যেমন কর্মীদের উন্নয়নকল্পে সুদূরপ্রসারী ও বাস্তবমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে এবং কর্মীরাও তাদের দুর্বলতা নিরসনকল্পে সচেষ্ট হতে পারে।

প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়েই প্রতিনিয়ত কর্মী নিয়োগ, পদোন্নতি, স্থাপনা, বদলি, ছাঁটাই প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সকল সিদ্ধান্ত কর্মীদের মেধা ও যোগ্যতার উপর ভিত্তি করেই হবে তা সবাই প্রত্যাশা করে। এ জন্য প্রতিষ্ঠানে কর্ম সম্পাদন মূল্যায়ন নিরপেক্ষ, উদ্দেশ্যমূলক ও রীতিবদ্ধভাবে হওয়া প্রয়োজন এবং এ মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করেই কর্মীদের পদমর্যাদা, বেতন, পদোন্নতি প্রদানের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্চনীয়।

কর্ম সম্পাদন মূল্যায়নের উদ্দেশ্য(Objectives of Performance Appraisal)

কর্ম সম্পাদন মূল্যায়ন কর্মী সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহ করে। এ তথ্য কর্মী সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে দিক নির্দেশনা প্রদান করে । নিচে কর্ম সম্পাদন মূল্যায়নের উদ্দেশ্যগুলো আলোচনা করা হলো ঃ

১. কর্মী নির্বাচন *(Employee selection)* ঃ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল কর্মী সমান পারদর্শী নয়। এদের মধ্যে কারো দক্ষতা বেশি কারো দক্ষতা কম। কর্মীদের অনেকেই পদোন্নতি পাওয়ার যোগ্য। আবার অনেকে আছেন বর্তমান পদটি ধরে রাখার জন্যও উপযুক্ত নয়। কর্ম সম্পাদন মূল্যায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে এ সকল দক্ষ, অদক্ষ, পদোন্নতি ও পদাবনতির যোগ্য কর্মীদের বাছাই করা।

২. কাজে অনুপ্রাণিত করা *(Inspire to work)* ঃ কর্মীদের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেও কর্ম সম্পাদন মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়নের ফলে কর্মীরা যদি ভালো ফলাফল পায় তবে স্বাভাবিকভাবেই তারা কাজে অনুপ্রানিত হয়। আবার খারাপ ফলাফল পেয়ে সেটা কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করে।

৩. জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন *(Develop standard of living)* ঃ কর্মীদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করার উদ্দেশ্যেও কর্ম সম্পাদন মূল্যায়ন করা হয়। কারণ মূল্যায়নের ফলাফল ভালো হলে কর্মীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পায়। এতে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

৪. প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ*(Determine needs of training)* ঃ কর্ম দক্ষতা বাড়াতে হলে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। কিন্তু কোন কর্মীর জন্য কি ধরণের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তা প্রতিষ্ঠানের জানা থাকে না। এ ক্ষেত্রে কর্ম সম্পাদন মূল্যায়নের ফলাফল দেখে কোন কোন কর্মীর জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন ব্যবস্থাপনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়।

৫. কর্মী মনোবল বৃদ্ধি*(Increase employee morale)* ঃ কর্মীর মনোবল উন্নয়ন করা কর্ম সম্পাদন মূল্যায়নের আরেকটি উদ্দেশ্য। কর্ম সম্পাদন মূল্যায়নের ফলে কর্মীরা তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে ধারণা পায়। এতে তাদের মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতাও বেড়ে যায়।

৬. পদ পরিবর্তনের নির্দেশনা*(Guide to post changes)* ঃ কর্ম সম্পাদন মূল্যায়নের দ্বারা কর্মীদের কর্মেও প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় এবং এর ফলাফল কর্মীদের বদলি, পদোন্নতি, পদাবনতি, ছাঁটাই ইত্যাদি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে ব্যবস্থাপকদের দিক নির্দেশনা দান করে।

৭. মজুরী ও বেতন নির্ধারণ*(Determine wages and salaries)* ঃ কর্মীদের বেতন ও মজুরী নির্ধারনের উদ্দেশ্যে কর্ম সম্পাদন মূল্যায়ন করা হয়। কারণ কর্মীরা তাদের কৃত কাজ অনুযায়ী বেতন ও মজুরি আশা করে। কর্ম সম্পাদন মূল্যায়ন এ ক্ষেত্রে তাই বিশেষ দরকার।

৯. আত্ম উন্নয়ন*(Self-development)* ঃ কর্ম সম্পাদন মূল্যায়নের ফলাফল দেখে কর্মীরা নিজের কাজের উন্নয়ন ঘটাতে সচেষ্ট হয়। কর্মীরা যখন বুঝতে পারে যে মূল্যায়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হযেছে তখন তারা নিজেদের দোষক্রটি সংশোধন করে আত্ম উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালায়। তাই কর্মীদের মধ্যে আত্ম উন্নয়নের তাগিদ সৃষ্টির জন্যও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্ম সম্পাদন মূল্যায়ন কার্যক্রম হাতে নেয়।

১০. তথ্য সংগ্রহ*(Data collection)* ঃ কর্ম সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কর্ম সম্পাদন মূল্যায়ন করা হয়। অর্থাৎ কর্মীরা তাদের কাজের কতটুকু সম্পাদন করতে পেরেছে, কাজ করতে গিয়ে কি কি সমস্যার মুখোমুখি হলো এবং সংশোধনমূলক কোন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে কি না এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কর্ম সম্পাদন মূল্যায়ন করা হয়।

কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের একাধিক উদ্দেশ্য আছে। এর কোনটি প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত আবার কোনটি কর্মরত মানব সম্পদের সম্ভাবনাকে বিকশিত করার উদ্দেশ্যের সাথে যুক্ত। তবে মানব সম্পদকে অনুপ্রানিত করার জন্য কর্ম সম্পাদন মূল্যায়নের বিশেষ দরকার। যোগ্যতার সঠিক মূল্যায়ন করা হলে তা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উভয়ের জন্যই অনুপ্রেরণার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশে কর্ম সম্পাদন মূল্যায়ন পদ্ধতি
(Methods of Performance Appraisal in Bangladesh)

বাংলাদেশে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মূল্যায়নের জন্য বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে একটি ফরমে একজন কর্মীর কর্ম সম্পাদনের পরিমাণ ও গুণগত মান ও চারিত্রিক গুণাবলীর উল্লেখ থাকে।

মূল্যায়ণ ফরমটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রধানত দুই প্রকারের উপাদান বিবেচনায় এনেই কর্মকর্তা/কর্মচারীর মূল্যায়ন করা হয়। প্রথম শ্রেণির উপাদানগুলো কাজের সাথে জড়িত, তবে প্রত্যক্ষভাবে নয় যেমন ঃ কর্মীর শৃঙ্খলাবোধ, বুদ্ধিমত্তা, উদ্যম ও উদ্যোগ, ব্যক্তিত্ব, সহযোগীতা, নির্ভরযোগ্যতা, দায়িত্ববোধ, অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা প্রভৃতি বিবেচনায় আনা হয়। দ্বিতীয় অংশের উপাদানগুলো কাজের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। যেমন ঃ কাজের মান, পরিমান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা, তদারকি ও পরিচালনা সামর্থ্য, প্রকাশ ক্ষমতা, অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ দানের আগ্রহ ও ক্ষমতা প্রভৃতি।

কর্মকর্তা/কর্মীর উপরস্থ তত্ত্বাবধায়ক (Supervisor) তার মূল্যায়ন প্রতিবেদন বিনিময় করে এবং এ প্রতিবেদন পুনরায় উপরস্থ অফিসার কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হয়। প্রতিস্বাক্ষরকারী অফিসার প্রয়োজন মনে করলে মুল্যায়ন প্রতিবেদন পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারেন। তবে এ জন্য তাকে সুনির্দিষ্ট কারণ প্রদর্শন করতে হয়। একশত নম্বরের ভিত্তিতে সকল কর্মী/কর্মকর্তাকে মূল্যায়ন করা হয়। বিভিন্ন উপাদানগুলোর মধ্যে এ মান বন্টন করা হয়। নম্বরের উপর ভিত্তি করে অসাধারণ, অত্যুত্তম, উত্তম, চলতি মান ও চলতি মানের নিচে এ পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। প্রাপ্ত নম্বর ৯৫-১০০ হলে অসাধারণ, ৮৪-৯৪ অত্যুত্তম, ৬১-৮৪ উত্তম, ৪১-৬০ চলতি মান, ৪০ ও তদনিম্ন চলতি মানের নিচে নেয়া হয়।

কর্মী/কর্মকর্তাদের মূল্যায়ন বৎসরে একবারই হয়ে থাকে। বার্ষিক মূল্যায়ন ফরমটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অজ্ঞাতে পূরণ করা হয়। মূল্যায়ন ফলাফল গোপন রাখা হয় এবং ভাল ও খারাপ দিকগুলো বিশ্লেষণ করে উপদেশ প্রদানের কোন ব্যবস্থা নেই। এতদসংগে আমাদের দেশে কর্মী মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের একটি ফরম দেয়া হলো ঃ

কর্ম সম্পাদন মূল্যায়ণ ছক

গোপনীয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অফিসের নাম .... হতে ....

পর্যন্ত কাজের জন্য বার্ষিক/বিশেষ অনুবেদন

২য় অংশ-জীবন বৃত্তান্ত
(অনুবেদনাধীন কর্মকর্তা পূরণ করবেন)

১। নাম (স্পষ্টাক্ষরে)-

২। পদবী-

৩। জন্ম তারিখ-

৪। পিতার নাম-

৫। (ক) বৈবাহিক অবস্থা-

(খ) বর্তমান সন্তান সংখ্যা-

৬। সার্ভিস/ক্যাডারের নাম (থাকলে)-

৭। ২০...... এর চাকরির জ্যেষ্ঠতা তালিকায় ক্রমিক নং-

৮। চাকরিতে প্রবেশের তারিখ ঃ (ক) সরকারি চাকরিতে-

(খ) গেজেটেড পদে-

(গ) ক্যাডারে-

৯। বর্তমান পদে যোগদানের তারিখ ঃ

১০। (ক) বেতন স্কেল- (খ) বর্তমান বেতন-

১১। শিক্ষাগত যোগ্যতা-

১২। প্রশিক্ষণ ঃ

(ক) দেশে-

(খ) বিদেশে-

১৩। বিদেশী ভাষায় দক্ষতা ঃ

কথন-

পঠন-

লিখন-

১৪। অনুবেদনকারী কর্মকর্তার অধীনে চাকরির পূর্ণ মেয়াদ .... হতে ....পর্যন্ত

১৫। অনুবেদনে বিবেচ্য সময়ের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণ ঃ

(ক)

(খ)

(গ)

(ঘ)

(ঙ)

তারিখ ....

অনুবেদনাধীন কর্মকর্তার
স্বাক্ষর ও সীল

(৩য় ও ৪র্থ অংশ অনুবেদনকারী অনুস্বাক্ষর দ্বারা পূরণ করবেন)

৩য় অংশ-ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য

মূল্যায়নের বিষয়	প্রাপ্ত নম্বর			
	৪	৩	২	১
২.১ শৃঙ্খলাবোধ				
২.২ বিচার ও মাত্রাজ্ঞান				
২.৩ বুদ্ধিমত্তা				
২.৪ উদ্যম ও উদ্যোগ				
২.৫ ব্যক্তিত্ব				
২.৬ সহযোগিতা				
২.৭ সময়ানুবর্তিতা				
২.৮ নির্ভরযোগ্যতা				
২.৯ দায়িত্ববোধ				
২.১০ কাজে আগ্রহ				
২.১১ ব্যবস্থা গ্রহণে ও আদেশ পালনে তৎপরতা				
২.১২ নিরাপত্তা সচেতনতা				
২.১৩ জনসাধারণের সাথে ব্যবহার				

৪র্থ অংশ-কার্য সম্পাদন

৩.১ পেশাগত জ্ঞান				
৩.২ কাজের মান				
৩.৩ সম্পাদিত কাজের পরিমাণ				
৩.৪ তদারকি ও পরিচালনায় সামর্থ্য				
৩.৫ সহকর্মীদের সাথে সম্পর্ক				
৩.৬ সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতা				
৩.৭ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সামর্থ				
৩.৮ অধীনস্থদের প্রশিক্ষণদানে আগ্রহ ও দক্ষতা				
৩.৯ প্রকাশ ক্ষমতা (লিখন)				
৩.১০ প্রকাশ ক্ষমতা				
৩.১১ বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন লিখন ও প্রতিস্বাক্ষরকরণে তৎপরতা				
৩.১২ কর্তব্যনিষ্ঠা				

	অসাধারণ	অত্যুত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিচে
	৯৫-১০০	৮৫-৯৪	৬১-৮৪	৪১-৬০	৪০ ও তদনিম্ন
মোট প্রাপ্ত নম্বর					

অনুবেদনকারীর অনুস্বাক্ষর

৫ম অংশ- লেখচিত্র
(অনুবেদনকারী পূরণ করবেন)

৬ষ্ঠ অংশ- সুপারিশ
(অনুবেদনকারী পূরণ করবেন)

১। সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ঃ

(ক) বিশেষ প্রবণতা/যোগ্যতা (যথা ঃ প্রশাসনিক/দাপ্তরিক/বহিরাংগন/অন্যান্য)

(খ) সততা ও সুনাম ঃ (১) নৈতিক-

(২) বুদ্ধিবৃত্তিক-

(৩) বৈষয়িক-

(গ) চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের জন্য আরও সুপারিশ-

২। পদোন্নতির যোগ্যতা (প্রযোজ্যটি রেখে বাকীগুলো কেটে দিবেন) ঃ

(ক) পদোন্নতির যোগ্য

(খ) এখনও পদোন্নতির যোগ্য হন নি

(গ) যোগ্যাতার সর্বোচ্চ সীমানায় পৌছেছেন

(ঘ) সম্প্রতি পদোন্নতিপ্রাপ্ত, পরবর্তী পদোন্নতি বিবেচনার সময় হয়নি।

৩। অন্যান্য সুপারিশ (যদি থাকে) ঃ

অনুবেদনকারীর স্বাক্ষর ও সীল
নাম (স্পষ্টাক্ষরে)
পদবী
তারিখ

৭ম অংশ- প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার মন্তব্য

আমি মনে করি যে, অনুবেদনকারীর মূল্যায়ন অত্যুত্তম/যুক্তিসংগতভাবে উত্তম/কঠোর/নমনীয়/ পক্ষপাতদুষ্ট। অধিকন্তু নিচে আমার মন্তব্য যোগ করছি ঃ

(ক) সাধারণ মন্তব্য ঃ

(খ) সামগ্রিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রদেয় মোট নম্বর [ ]

প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকতার স্বাক্ষর ও সীল
নাম (স্পষ্টাক্ষরে)
পদবী
তারিখ

৮ম অংশ
(মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক পূরণের জন্য)

১। পূরণ করা ফরম প্রাপ্তির তারিখ ঃ
২। অস্বাভাবিক বিলম্বের কারণ ঃ
৩। দরখাস্তের উপর কার্যক্রম (যদি থাকে)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল
নাম (স্পষ্টাক্ষরে)
পদবী
তারিখ

হ্যান্ডআউট ৪.২ ঃ সরকারী কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপীল বিধিমালা এবং সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধিমালা

সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপীল বিধিমালা, ১৯৮৫

২। সংজ্ঞাসমূহ- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকলে এই বিধিমালায়,

(এ) ''অভিযুক্ত'' বলতে এ বিধিমালার আওতায় যার বিরুদ্ধে কোনব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তাকে বুঝাবে।

(বি) ''কর্তৃপক্ষ'' বলতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কিংবা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশনা সাপেক্ষে এই বিধিমালার আওতায় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য তৎকর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তাকে বুঝাতে এবং কর্তৃত্বের ধারাবাহিকতা অনুসারে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাও কর্তৃপক্ষ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হবেন।

(সি) ''কমিশন'' বলতে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনকে বুঝাবে।

(ডি) ''ডিজারশন'' বলতে বিনা অনুমতিতে চাকুরী বা কর্মস্থল ত্যাগ করা, অথবা ষাট দিন বা এর অধিককাল কর্তব্য হতে অনুপস্থিত থাকা, অথবা অনুমতিসহ কর্তব্য অনুপস্থিতির ধারাবাহিকতায় অনুমোদিত মেয়াদের পর ষাট দিন বা তদূর্ধ্ব সময় পুনঃ অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকা, অথবা বিনা অনুমতিতে দেশ ত্যাগ পূর্বক ত্রিশ দিন বা অদূর্ধ্ব সময় বিদেশে অবস্থান করা, অথবা অনুমতিক্রমে দেশ ত্যাগ করে বিনা অনুমতিতে অনুমোদিত সময়ের পর ষাট দিন বা তদূর্ধ্ব সময় বিদেশে অবস্থান করাবে বুঝাবে;

(ই) ''সরকারি কর্মচারী'' বলতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিকে বুঝায়।

(এফ) '' অসদাচরণ'' বলতে চাকুরী শৃঙ্খলা বা নিয়মের ক্ষতিকর বা সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯ এর কোন বিধানের পরিপন্থী অথবা কোন কর্মকর্তা বা ভদ্রলোকের পক্ষে লোভনীয় নয় এমন আচরণকে বুঝাবে, এবং নিম্নোক্ত আচরণসমূহও এর অন্তর্ভূক্ত হবে-

(১) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের আইনসংগত আদেশ অমান্যকরণ;

(২) কর্তব্যে চরম অবহেলা;

(৩) আইনসংগত কারণ ছাড়া সরকারের কোন আদেশ, পরিপত্র বা নির্দেশের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন; এবং

(৪) কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে নগ্ন, বিরক্তিকর, মিথ্যা অথবা অসার অভিযোগ সম্বলিত দরখাস্ত পেশকরণ; এবং

(জি) ''দন্ড'' বলতে এ বিধিমালার আওতায় আরোপিত দন্ডকে বুঝাবে।

৩। দন্ডের ভিত্তি- যদি কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, একজন সরকারি কর্মচারী-

(এ) নিম্নোক্ত কারণে অদক্ষ হন অথবা দক্ষতা পুনঃ অর্জনের কোন রকম সম্ভাবনা নেই,

(i) শারীরিক অথবা মানসিক বৈকল্য (রহভরৎসরঃু), অথবা

(ii) সাধারণ দক্ষতা রক্ষা বা বৃদ্ধির জন্য নির্ধারিত বিভাগীয় পরীক্ষায় পর পর দুই বা ততোধিক বার উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হওয়া, অথবা

(iii) যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে উপর্যুক্ত যে কোন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হওয়া, অথবা

(iv) অন্য কোন ভাবে এবং তার দক্ষতা পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা না থাকলে, অথবা

(বি) অসদাচরণ এর জন্য দোষী হলে; অথবা

(সি) ডিজারশনের অপরাধে দোষী হলে; অথবা

(ডি) দুর্নীতিপরায়ণ হওয়া বা নিম্নোক্ত কারণে যুক্তিসংগতভাবে দুর্নীতিপরায়ণ বলে বিবেচিত হলে-

(ই) নাশকতামূলক কাজে জড়িত থাকলে বা জড়িত থাকার যুক্তিসংগত সন্দেহ থাকলে বা নাশকতামূলক কাজের সংগে জড়িত ব্যক্তির সাথে যোগসাজসের যুক্তিসংগত সন্দেহ থাকলে

৪। দন্ডসমূহ- (১) এই বিধিমালার অধীনে দু ধরনের দন্ড আরোপের বিধান আছে, যথা- লঘু দন্ডসমূহ এবং গুরুদন্ডসমূহ

(২) লঘু দন্ডসমূহ নিম্নরূপ :

(এ) তিরস্কার (censure);

(বি) চাকুরী বা পদের সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্য কোন বিধি আদেশ বলে পদোন্নতি বা আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির অযোগ্য না হলে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত পদোন্নতি অথবা বেতন বৃদ্ধি (Increment) স্থগিতকরণ;

(সি) অন্য কোন কারণে দক্ষতা সীমা অতিক্রমের অযোগ্য না হলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য টাইম স্কেলে দক্ষতা সীমা অতিক্রম বন্ধকরণ;

(ডি) অবহেলা বা আদেশ অমান্য জনিত কারণে সৃষ্ট সরকারের আর্থিক ক্ষতির সমুদয় বা অংশ বিশেষ বেতন অথবা আনুতোষিক হতে আদায়করণ;

(ই) টাইম স্কেলের নিম্ন ধাপে নামিয়ে দেওয়া;

(৩) গুরুদন্ডসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(এ) নিম্ন পদে বা টাইম স্কেলে নামিয়ে দেওয়া;

(বি) বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান;

(সি) চাকুরী হতে অপসারণ;

(ডি) চাকুরী হতে বরখাস্ত।

(৪) চাকুরী হতে অপসারণের ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু চাকুরী হতে বরখাস্তের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সরকারি বা কোন আইনের অধীনে বা আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় নিয়োগের অযোগ্য বলে গণ্য হবে।

(৫) নিম্নোক্তভাবে দন্ডসমূহ আরোপ করা যেতে পারে-

(এ) শারীরিক অথবা মানসিক অদক্ষতার জন্য তিরস্কার এবং চাকুরী হতে বরখাস্ত ব্যতিরেকে অন্য যে কোন দন্ড;

(বি) অন্য কোনরূপ অদক্ষতার জন্য চাকুরী হতে বরখাস্ত করা ব্যতিরেকে অন্য যে কোন দন্ড;

(সি) অসদাচরণের জন্য যে কোন দন্ড;

(ডি) ডিজারশনের জন্য যে কোন দন্ড;

(ই) দুর্নীতি বা নাশকতামূলক কার্যকলাপের জন্য নিম্ন পদে বা টাইম স্কেলে নামিয়ে দেয়া ব্যতিরেকে অন্য যে কোন প্রকার গুরুদন্ড।

(৬) কোন সরকারি কর্মচারীর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধঃস্তন কোন কর্তৃপক্ষ তার উপর গুরুদন্ড আরোপের জন্য উপযুক্ত হবেন না।

৬। লঘু দন্ড আরোপের ক্ষেত্রে তদন্ত পদ্ধতি- কোন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে ----

৭। গুরুদন্ড আরোপের ক্ষেত্রে তদন্ত পদ্ধতি-

১১। সাময়িক বরখাস্ত

কোন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিধি-৩-এর (বি) বা (সি) বা (ডি) অনুচ্ছেদের আওতায় কোন ব্যবস্থা গ্রহণের করা হলে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় বা সমীচীন মনে করলে তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারেন।

১৩। পুনর্বহাল- (১) যদি বিধি-৫ এর উপবিধি (১) এর অনুচ্ছেদের আওতায় ছুটিতে প্রেরিত কোন সরকারি কর্মচারীকে চাকুরী হতে বরখাস্ত বা অপসারিত বা নিম্ন পদে পদাবনত করা না হয়, সেক্ষেত্রে তিনি চাকুরীতে পুর্নবহাল হবেন অথবা, ক্ষেত্র বিশেষ তিনি তার পদমর্যাদায় আসীন বা সমপদমর্যাদা প্রাপ্ত হবেন এবং তার ঐ ছুটিকালীন সময়কে পূর্ণ বেতনে কতর্ব্যরত ছিলেন বলে গণ্য করা হবে।

১৬। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারিকৃত আদেশ আপীলযোগ্য নয়--

১৭। আদেশের বিরুদ্ধে আপলি - (১) একজন সরকারি কর্মচারী নিম্নোক্ত যে-কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করতে পারেন-

(এ) তার উপর কোন দন্ড আরোপ করা হলে,

(বি) যদি তিনি চুক্তিভিত্তিতে নিয়োজিত হয়ে থাকেন, এবং চুক্তির শর্তানুযায়ী তার চাকুরী অবসান করা হয়, এবং যখন তার অবসান ঘটানো হয় তখন তিনি ধারাবাহিকভাবে পাঁচ বছরের অধিদকাল চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন,

১৮। আপীল দাখিলের মেয়াদ- যদি আপীলকারী তার বিরুদ্ধে প্রদত্ত আদেশ অবহিত হবার তারিখের তিন মাসের মধ্যে দায়ের না করে, আপীল গ্রহণীয় হবে না, তবে শর্ত থাকে যে, আপীলেট কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আপীলকারী কর্তৃক যথা সময়ে আপীল দাখিল না করার পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে, তা হলে আপীলেট কর্তৃপক্ষ উলিখিত সময়কাল অতিবাহিত হবার পর তিন মাসের মধ্যে আপীল গ্রহণ করতে পারেন।

২২। আপীল নিষ্পত্তি-

১৭(১) কোন দন্ড আরোপের আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের ক্ষেত্রে আপীলেট কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করবেন-

(এ) এই বিধিমালায় বর্ণিত পদ্ধতি পালন করা হয়েছে কি-না এবং না হয়ে থাকলে, তার কারণে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হয়েছে কি-না;

(বি) অভিযোগের উপর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত ন্যায়সংগত হয়েছে কি-না এবং

(সি) আরোপিত দন্ড অধ্যাধিক, পর্যাপ্ত অথবা অপর্যাপ্ত কি-না এবং যেরূপ উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে সেরূপ আদেশ প্রদান করবেন।

(২) আপীলেট কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আদেশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে যে কর্তৃপক্ষের আদের্শের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে, সে কর্তৃপক্ষ, আপীলেট কর্তৃপক্ষের আদেশ কার্যকর করবেন।

পুনর্বির্বেচনা এবং সুশোধন

২৩। পুনর্বিবেচনা- (১) কোন সরকারি কর্মচারী, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে, উক্ত আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারি কর্মচারী রাষ্ট্রপতির নিকট আবেদন করতে পারেন।

(৫) রাষ্ট্রপতি পুনর্বিবেচনার আবেদনের উপর যেরূপ উপযুক্ত বলে মনে করেন সেরূপ আদেশ দিতে পারেন।

সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯

ধারা-৩

(এ) 'সরকারী কর্মচারী' বলতে বোঝায়, যাদের বেলায় এই বিধিমালা প্রযোজ্য তাদেরকে এবং
(বি) 'সরকারী কর্মচারীর পরিবারের সদস্য বলতে বোঝায়-

(১) সরকারী কর্মচারীর স্ত্রী, সন্তান, বা সন্তানগণ, তার সাথে বসবাস করুক বা না করুক।

(২) সরকারী কর্মচারীর সাথে বসবাস করেন এবং তার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল সরকারী কর্মচারীর নিজের বা তার স্ত্রীর কোন আত্নীয়স্বজন, অথবা সন্তান বা সৎসন্তান যিনি কোনভাবেই আর তার ওপর নির্ভরশীল নন অথবা যার অবিভাবকত্ব সরকারী কর্মচারী আইনের ফলে হারিয়েছেন। তারা সরকারী কর্মচারীর পরিবারের সদস্য বলে গণ্য হবেন না।

ধারা-৫: উপহার সামগ্রী

১। কোন সরকারী কর্মচারী সরকারের পূর্বানুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তির কাছ থেকে তিনি নিজে কোন উপহার গ্রহণ করতে বা তার পরিবারের কোন সদস্যকে গ্রহণের অনুমতি প্রদান করতে পারবেন না যা গ্রহণে তাকে অফিস সংক্রান্ত কর্তব্য পালনে যা তার নিকট কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ করে। তবে যদি উপহার সামগ্রীটি ফেরত প্রদানের প্রস্তাব উপহার যা তার মনোকষ্টের কারণ হয় সে ক্ষেত্রে তা নিস্পত্তির সিদ্ধান্তের জন্য সরকারের নিকট অর্পন করতে হবে।

৩। কোন বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রতিনিধি কোন উপহার সামগ্রী প্রদান করতে চাইলে, সেক্ষেত্রে কোনরকম মনোকষ্ট প্রদান করা ছাড়া এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর তা এড়িয়ে যাওয়া উচিৎ। যদি কোনভাবে তা সম্ভব না হয় তাহলে নিস্পত্তির জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন।

সরকারের সচিব বা সমপদমর্যাদা সম্মন্ন কোন কর্মকর্তা বিদেশে বা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন প্রতিষ্ঠানে অথবা, বিদেশী সরকারের উচ্চ পর্যায়ভুক্ত বিশিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত উপহার সামগ্রী গ্রহণ করতে পারবেন। তবে এই উপহার সামগ্রীর মূল্য কোন ক্ষেত্রেই ৫০০/-(পাঁচ শত) টাকার অধিক হবে না।

ধারা- ৬ বিদেশী পুরস্কার গ্রহণ- কোন সরকারী কর্মচারী রাষ্ট্রপতির পূর্বনুমতি ছাড়া কোন বিদেশী পুরষ্কার, পদবী বা উপাধি গ্রহণ করতে পারবেন না।

ধারা- ৭সরকারী কর্মচারীর সম্মানে গণজমায়েত - (১) কোন সরকারী কর্মচারী তার সম্মানে কোন সভা অথবা তাকে প্রশংসা করার উদ্দেশ্যে কোন বক্তৃতা বা তার সম্মানে কোন আপ্যায়নের জন্য কোন গণজমায়েতকে উৎসাহিত করবেন না।

(২) কোন সরকারী কর্মচারী তার নিজের বা অন্য কর্মচারীর অবসর গ্রহণ বা চাকুরী ত্যাগ যা এক জেলা বা কর্মস্থল থেকে অন্যত্র বদলী উপলক্ষে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত বেসরকারী এবং অনাম্বরপূর্ণ ফেয়ার ওয়েল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

ধারা-৮সরকারী কর্মচারী কর্তৃক তহবিল সংগ্রহ- অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পের আংশিক ব্যয় স্থানীয় চাঁদার মাধ্যমে মেটানোর প্রয়োজন হলে একজন সরকারী কর্মচারী অনুমতি ছাড়াই তহবিল সংগ্রহ করতে পারবেন।

ধারা-৯ চাঁদা - কোন সরকারী কর্মচারী সরকারের সুনির্দিষ্ট আদেশ এবং সরকারের নির্দেশ ছাড়া কোন চাঁদা আদায়ের জন্য বলতে, গ্রহণ করতে বা অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

ধারা- ১০ ধার দেওয়া বা নেওয়া কোন সরকারী কর্মচারী তার এখতিয়ারাধীন এলাকার কোন ব্যক্তির নিকট থেকে বা যে ব্যক্তির সাথে তার অফিস সংক্রান্ত কাজে কোন প্রকার আর্থিক সংশ্লিষ্টতা আছে, তাকে ধার দিতে বা তার নিকট থেকে ধার নিতে পারবেন না।

ধারা -১১মূলবান স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় এবং বিক্রয়-
কোন সরকারী কর্মচারী কোন ব্যক্তির সাথে ১৫০০০/- (পনের হাজার) টাকার অধিক মূল্যের স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়, বিক্রয় বা অন্য কোন পদ্ধতিতে হস্তান্তর করতে মনস্থ করলে তিনি বিভাগীয় প্রধান /সচিব এর নিকট তার অভিপ্রায় ব্যক্ত করবেন।

ধারা -১২ ভবণ নির্মাণ ইত্যাদি- কোন সরকারী কর্মচারী নির্মাণ ব্যয়ের অর্থেও উৎসের প্রকাশ করা ছাড়া এবং সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ না করে আবাসিক বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য কোন ভবণ নির্মাণ করতে পারবেন না।

ধারা-১৫ফটকা ও বিনিয়োগ- কোন সরকারী কর্মচারী ফটকা কারবারে বিনিয়োগ করতে পারবেন না।

ধারা-১৭ ব্যক্তিগত ব্যবসা বা চাকুরী - কোন সরকারী কর্মচারী সরকারের পূর্বানুমতি ছাড়া তারা অফিসিয়াল দায়িত্বের অতিরিক্ত কোন ব্যবসা বা চাকুরিতে নিযুক্ত হতে পারবেন না।

ধারা- ২০ সংসদ সদস্যের নিকট তদবির একজন সরকারী কর্মচারী তার পক্ষে কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কোন সংসদ সদস্য বা অন্য বেসরকারী ব্যক্তির নিকট তদবির করবেন না।

ধারা-২১সংবাদপত্র বা সাময়িকীর ব্যবস্থাপনা - কোন সরকারী কর্মচারী সরকারের পূর্বানুমতি ছাড়া কোন সংবাদপত্র বা অন্য কোন সাময়িকীর সম্পূণ বা আংশিক স্বত্বাধিকার অর্জন করতে পারবেন না বা পরিচালক বা সম্পাদনা বা ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করবেন না।

ধারা -২২ বেতারে প্রচার সংবাদপত্র প্রকাশ- কোন সরকারী কর্মচারী তার বিভাগীয় প্রধানের পূর্বানুমতি ছাড়া বেতারে বা টেলিভিশনের সম্প্রচারের কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে বা সংবাদপত্র বা সাময়িকীতে ছদ্মনামে বা নিজের নামে বা অন্য কোন ব্যক্তির নামে কোন প্রবন্ধ বা কোন পত্র লিখতে পারবেন না।

ধারা -২৩ সরকারের সমালোচনা এবং বিদেশী রাষ্ট্র সম্পর্কীয় বিষয়ে তথ্য বা মতামত প্রকাশঃ

(১) কোন সরকারী কর্মচারী নিজ নামে প্রকাশিত কোন ডক্যুমেন্ট প্রকাশ্য জনসম্মুখে অথবা বেতার সম্প্রচার বা টেলিভিশনে এমন কোন তথ্যাদি বা মতামত প্রকাশ করবেন না যা বিব্রত করতে পারে।

ধারা- ২৫রাজনীতি এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ: কোন সরকারী কর্মচারী কোন রাজনৈতিক দল বা কোন রাজনৈতি দলের অধিভুক্ত কোন সংগঠনের সদস্য হতে পারবেন না। বা অন্যভাবে জড়িত হতে পারবেন না, যা কোন উপায়ে বাংলাদেশে বা বিদেশে কোন রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, বা সহযোগিতা করতে পারবেন না।

ধারা- ২৬ সাম্প্রদায়িক ধর্মমত প্রচারঃ কোন সরকারী কর্মচারী সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ ধর্মমত প্রচার করতে বা সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ বিতর্কিত বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে বা সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব বা সজনপ্রীতিকে প্রশ্রয় দিতে পারবেন না, যা তার কর্তব্যপালনে ন্যায়পরায়নতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে বা প্রশাসনকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলতে পারে যা বিশেষভাবে সরকারী কর্মচারী এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে অসন্তোষ বা ক্রোধের মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে।

ধারা - ২৭স্বজনপ্রীতি, প্রিয়ভাজন, এবং বেআইনীভাবে ক্ষতিগ্রস্থকরা-
কোন সরকারী কর্মচারী সংকীর্ণতা, প্রিয়ভাজন ও বেআইনীভাবে ক্ষতি গ্রস্থকরণ এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রশ্রয় দিতে পারবেন না।

ধারা -২৭ (ক) মহিলা সহকর্মীগণের প্রতি আচরণ : কোন সরকারী কর্মচারী তার মহিলা সহকর্মীগণের সাথে এমন কোন ভাষা ব্যবহার করবেন না, এমন কোন আচরণ করবেন না, যা অনুষ্ঠিত এবং অফিসের শালিনতা ও মহিলা সহকর্মীগণের মর্যাদা ক্ষুন্ন করে।

ধারা -২৭ (খ) : যদি কোন সরকারী কর্মচারীর স্বামী / স্ত্রী রাজনৈতিক দলের সদস্য আছেন বা কোন প্রকার কোন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত থাকেন, সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারী, অনতিবিলম্বে তা সরকারকে লিখিতভাবে জানাবেন।

ধারা -৩০ : রাজনৈতিক যা অন্যরূপ প্রভাবে প্রয়োগ – কোন সরকারী কর্মচারী তার চাকুরী সংক্রান্ত কোন দাবির সমর্থনে সরকার যা কোন সরকারী কর্মচারীর উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক যা বাইরের অন্য কোন প্রভাব খাটাতে বা খাটানোর চেষ্টা করতে পারবেন না।

ধারা- ৩০ এ- সরকারী সিদ্ধান্ত,আদেশ- কোন সরকারী কর্মচারী

(ক) সরকারের বা কর্তৃপক্ষের কোন আদেশ বা সিদ্ধান্ত পালনে বিরোধিতা বা বাধা প্রদান করতে পারবেন না এবং অন্যদেরও এ ধরণের কাজে প্রলুব্ধ বা সহযোগিতা করতে পারবেন না।

(খ) সরকারী কোন আদেশ বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য কোন অসন্তোষ বা বিরক্তি প্রকাশ করতে পারবেন না বা কোন বিক্ষোভে অংশগ্রহণে সহায়তা করতে পারবেন না।

(গ) কোন অন্যায় প্রভাব খাটাবেন না বা কোন আদেশ বা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন বা সংশোধনের জন্য সরকার বা কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারবেন না।

(ঘ) সরকারী কর্মচারীগণের মধ্যে -যা কোন শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর মধ্যে অসন্তোস, ভুলবোঝাবুঝি বা ঘৃণা সৃষ্টি করতে পারবেন না বা সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা নিতে পারবেন না বা অন্যকে এরূপ করতে সহায়তা করতে পারবেন না।

ধারা - ৩১ : বৈদেশিক মিশন এবং সাহায্য দাতা সংস্থাসমূহের নিকট তদবির: কোন সরকারী কর্মচারী তার নিজের জন্য বিদেশী রাষ্ট্রে ভ্রমণের নিমন্ত্রণ সংগ্রহ অথবা বিদেশে প্রশিক্ষণের সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশস্থ কোন বিদেশী মিশন বা সাহায্যদাতা সংস্থার নিকট তদবির করতে পারবেন না।

ধারা - ৩২ : বিধিমালার লঙ্ঘন- এই বিধিমালার কোন বিধির লঙ্ঘন "সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫" এর আওতায় অসদাচারণ বলে গণ্য হবে এবং কোন সরকারী কর্মচারী এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন এর জন্য দায়ী হলে উপর্যুক্ত বিধিমালার অধীনে শৃঙ্খলামূলক শাস্তির জন্য বিবেচিত হবেন।

হ্যান্ডআউট ৪.৩ ঃ পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন(Monitoring & Evaluation)

পরিবীক্ষণ (Monitoring)

মনিটরিং হচ্ছে কর্মসূচীর বিভিন্ন কর্মকান্ডের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং লিপিবদ্ধ করা। একটি কর্মসূচীর সমস্ত ধরনের দিকগুলো নিত্যনৈমিত্তিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ হচ্ছে পরিবীক্ষণ/মনিটরিং।

পরিবীক্ষণ এর মাধ্যমে একটি কর্মসূচীর/প্রকল্পের যোগান (*Input*), নির্যাত (*Output*), কার্যাবলী (*Activities*), ফলাফল (*Outcomes*), এবং প্রভাব (*Impact*)-কে নিত্যনৈমিত্তিকভাবে (*Routinely*) দৃষ্টি রাখা/খোঁজ রাখা।

কর্মসূচী/প্রকল্প চলাকালীন সময়ে নৈমিত্তিকভাবে অগ্রগতি পরিমাপ করা হয়। পরিকল্পনা পর্যায়ে যে লক্ষ্য/টার্গেট এবং কার্যাবলী ঠিক করা হয় সেগুলোর উপর ভিত্তি করে পরিবীক্ষণ করা হয়। পরিবীক্ষণ কার্যাবলীকে সঠিকভাবে সম্পদিত হচ্ছে কিনা পর্যালোচনা করে এবং ব্যবস্থাপনাকে কোন বিষয়ে ভুল হলে সে তথ্য প্রদান করে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য এটা একটা ভালো টুলস্ এবং যা মূল্যায়নের জন্য একটি প্রয়োজনীয় ভিত্তি স্থাপন করে।

কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য যে সম্পদ এবং ব্যবস্থা করা হয়েছে তা যথেষ্ট কিনা, সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচেছ কিনা এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যাবলী বাস্তবায়িত হচেছ কিনা এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যাবলী বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা পরিবীক্ষণ তাই পর্যবেক্ষণ করে।

পরিবীক্ষণ এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি কাজের দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনাকে সহায়তা করা। কিন্তু এছাড়াও এর আরো কিছু কারণ রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে-

- কর্মসূচী বাস্তবায়নের সময় অগ্রগতির প্রতি দৃষ্টি রাখা।
- ষ্টেকহোল্ডারদের সচেতন করা এবং তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- ফলাফল অনুযায়ী সম্পদ ব্যবহৃত হয়েছে কিনা।
- নিয়মিত মূল্যায়নের জন্য মূল উপাত্ত / তথ্য সরবরাহ করা।

পরিবীক্ষণ হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যা-

(১) অগ্রগতি যাচাই এবং পরিমাপ করে
(২) পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে
(৩) নূতন কার্যাবলী, সম্ভাবনা এবং দিকসমূহ নির্ধারণ করে।

এটা অত্যন্ত জরুরী যে পরিবীক্ষণের সময় পরিকল্পিত পদ্ধতিগত এবং নিয়মিতভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এ তথ্যসমূহ হতে পারে বিভিন্ন কার্যাবলী এবং সেবাসমূহ, ব্যবহারকারী অথবা বাইরের কিছু উপাদান যা কর্মসূচী বাস্তবায়নে বাধাগ্রস্থ করে।

পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রণয়নের ধাপসমূহ হচ্ছে-

ধাপ-১	:	উদ্দেশ্যসমূহ সংজ্ঞায়িত করা
ধাপ-২	:	সূচক (*Indicator*) সমূহ প্রণয়ন করা
ধাপ-৩	:	কার্যসম্পাদন বিশ্লেষণ করা

পরিবীক্ষণ এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

পুণঃ পুণঃ সংঘটন (*Frequency*)	:	চলমান
মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু (*Focus*)	:	অগ্রগতি যাচাই (*Tracking*)
উদ্দেশ্য (*Purpose*)	:	দক্ষতার উন্নয়ন, কর্মপরিকল্পনা খাপ খাওয়ানো / মানিয়ে নেয়া (*Adjust*)
উপাদান (*Component*)	:	যোগান (*Inputs*), নির্যাত (*Output*), প্রক্রিয়াজাত ফলাফল(*Process outcomes*), কর্মপরিকল্পনা(*Work plan*)
তথ্য সূত্র (*Information Source*)	:	নিত্যনৈমিত্তিক পদ্ধতি (*Routine system*) মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ (*Filed observation*) অগ্রগতির প্রতিবেদন (*Progress report*) দ্রুত যাচাই করা (*Rapid assessment*)

মনিটরিং এর কিছু পদ্ধতি, টুলস এবং এ্যাপ্রোচ :

- কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ (*Performance indicators*)
- আনুষ্ঠানিক সমীক্ষা (*Formal surveys*)
- দ্রুত সমীক্ষা পদ্ধতি(*Rapid appraisal methods*)
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি (*Participatory methods*)
- প্রভাব মূল্যায়ন (*Impact evaluation*)
- সরাসরি পর্যবেক্ষণ (*Live observation*)
- কর্ম-সম্পাদন সমীক্ষা (*Performance appraisal*)
- মাসিক প্রতিবেদন ফর্ম (*Monthly report form*)
- *Client feedback form*

মুল্যায়ন

মূল্যায়ন হচেছ কার্যাবলী বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ এর আলোকে প্রত্যাশিত ফলাফলের পর্যায়কৃত (*Periodic*) বা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সমীক্ষা পরিচালনা করা।

মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ সূচকসমূহ (*Indicators*)

কর্মসূচীর প্রভাব, ফলাফল, ইনপুট এবং আউটপুট এর সকল পর্যায়ে যে সূচকগুলো যাচাই করা হবে।

উদাহরণস্বরূপ : সামাজিক সূচকসমূহ হচ্ছে একটি কমিউনিটির লোকদের আর্থিক অবস্থা।

ভালো সুচক এর বৈশিষ্ট্যসমূহ

- প্রত্যক্ষ এবং অনভিপ্রায় বিশিষ্ট (*unambiguous*) অগ্রগতির পরিমাপ
- বিভিন্ন দল, এলাকা এবং সময় অনুযায়ী পার্থক্য হবে
- কর্ম সম্পাদন এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত
- নীতি তৈরীর সাথে সম্পৃক্ত
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সংগতিপূর্ণ
- সহজে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না (*manipulated*)
- পরিমাপ করা সহজসাধ্য এবং ব্যয় বহুল নয়
- সহজে বোধগম্য
- নির্ভরযোগ্য
- প্রাপ্ত উপাত্ত এবং এর সংগ্রহ করার সক্ষমতা সংগতিপূর্ণ ও রীতিমাফিক

সূচকের উদাহরণ

স্বাস্থ্য বিষয়ক (*Health*)

- *Life expectancy*
- *Maternal mortality and infant mortality*
- *Child bearing*
  - *Adolescent fertility rate*
  - *Total fertility rate*
- *Contraceptive prevalence*
  - *Contraceptive prevalence among married women of childbearing age, any modern method*
- *HIV/ADIS*

  Estimated number of adults living with HIV/AIDS

  Women's share of adults living with HIV/AIDS

মনিটরিং ও মূল্যায়ন ফ্রেমওয়ার্ক

ছক-১ঃ ফলাফল (Outcome level)

নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ***(Specific aims)***	ফলাফল ***(Outcome)***	ফলাফল সূচকসমূহ ***(Outcome indicators)***	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ***(Information collection methods)***	কখন এবং কার দ্বারা সম্পন্ন ***(When and by whom)***	প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং ব্যবহার ***(How to report and use)***
উদ্দেশ্য-১					
উদ্দেশ্য-২					
উদ্দেশ্য-৩					

ছক-২ঃ ফলাফল (Outcome level)

উদ্দেশ্যাবলী ***(Objectives)***	নির্যাত ***(Output)***	আউটপুট সূচকসমূহ ***(Outcome indicators)***	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ***(Information collection methods)***	কখন এবং কার দ্বারা সম্পন্ন ***(When and by whom)***	প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং ব্যবহার ***(How to report and use)***
উদ্দেশ্য-১					
উদ্দেশ্য-২					
উদ্দেশ্য-৩					

ছক-৩ঃ

একটি মনিটরিং এবং ইভেল্যুয়েশন ফ্রেমওয়ার্ক

সার্বিক প্রভাব**(Overall Impact)**	প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্ত	সূচক ***(indicators)***	দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ***(Information collection methods)***	তথ্য / উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং পরবর্তী পদক্ষেপ
উদাহরণ					

হ্যান্ডআউট ৪.৪.১ ঃ আর্থিক ব্যবস্থাপনা: হিসাববিজ্ঞান (Accounting)

আর্থিক ব্যবস্থাপনায় হিসাব (Accounting)-কে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে আয় ব্যয়ের হিসাব লিপিবদ্ধ করন ও নিয়ন্ত্রন বুঝায়। ইহা বার্ষিক নির্ধারিত বাজেটের আওতায় আর্থিক ব্যবস্থাপনার নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত। যাহা সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সরকারী হিসাব

বাংলাদেশে সরকারের তহবিলকে দুই ভাবে ভাগ করা হইয়াছে।

(১) সরকার কর্তৃক সংযুক্ত তহবিল

প্রাপ্ত সকল রাজস্ব, গৃহীত সকল ঋণ, ঋণ পরিশোধ হইতে প্রাপ্ত অর্থ একটি মাত্র তহবিলের অংশে পরিণত হইবে তাহা সংযুক্ত তহবিলে নামে অভিহিত।

(২) প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব

সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে প্রাপ্ত অন্য সকল সরকারী অর্থ প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে জমা হইবে।

সরকারী হিসাব পদ্ধতিতে এই উভয় প্রকার তহবিলকে একত্রে সরকারী হিসাব বলা হয়।

সরকারী হিসাবের সকল নগদ তহবিল বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষণ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সহিত সরকার কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ মোতাবেক সরকারের পক্ষে সকল সাধারণ লেনদেন যথা অর্থ প্রাপ্তি, আদায়, পরিশোধ ও প্রেরণ (Remittance) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত হয়।

সরকারের আর্থিক লেনদেন বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রত্যেক অফিস ও প্রত্যেক শাখা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের এজেন্ট হিসাবে নিয়োজিত সোনালী ব্যাংকের শাখাসমূহ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে।

সরকারী হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সকল প্রাপ্তি বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়। ডাক বিভাগ, টিএন্ডটি বোর্ড, গণপূর্ত বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, সড়ক ও জনপথ বিভাগ ছাড়া অন্যান্য সকল বিভাগের প্রাপ্তি সমূহের প্রাথমিক হিসাব মহা-হিসাব নিয়ন্ত্রকের নিয়ন্ত্রনাধীন অফিসার কর্তৃক সংরক্ষণ করা হয়। যেমন UAO, DAO, CAO|

উপরে উল্লেখিত বিভাগ গুলোর ক্ষেত্রে আদায়সমূহ যদিও ব্যাংকে জমা দেওয়া হয় এবং UAO ev DAO গণ উক্ত জমাকৃত অর্থের হিসাব সংরক্ষণ করেন তবে। উক্ত প্রাপ্তির বিস্তারিত হিসাব সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিসার কর্তৃক সংরক্ষিত হয়।

রেল বিভাগ বাংলাদেশ ব্যাংকের সহিত সরাসরি লেনদেন করিয়া থাকে।

সংযোজিত লেনদেনসমূহ যাহার প্রাথমিক হিসাব জেলা/উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসার কর্তৃক সংরক্ষণ করা হয়। উহার প্রাপ্তি এবং পরিশোধের হিসাব সাংবিধানিক কোড, প্রাতিষ্ঠানিক কোড, পরিচালন কোড ও অর্থনৈতিক কোড ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস করিয়া প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্নভাবে উন্নয়নব্যয়ের হিসাব সংকলন করা হয়।

প্রাথমিক হিসাব UAO / DAO শ্রেণী বিন্যাসকৃত মাসিক হিসাবের বিবরণী নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে দাখিল করা হয়। বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক তাহার নিজ অফিসে সংঘটিত লেনদেনসহ প্রাপ্ত হিসাব শ্রেণীবিন্যাস কোড মোতাবেক সংকলন করিয়া নির্ধারিত তারিখের মধ্যে মহা-হিসাব নিয়ন্ত্রকের অফিসে প্রেরণ করেন।

সকল সিএও গণও প্রাপ্তি ও ব্যয়ের হিসাব সংকলনপূর্বক সিজিএ অফিসে প্রেরণ করেন।

প্রধান হিসাব রক্ষণ অফিসারগণ এবং বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রকগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হিসাবের বিবরণীর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত হিসাবের সহিত বিনিময় হিসাব, সমন্বয় হিসাবের লেনদেনসমূহ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে প্রাপ্ত হিসাব অন্তর্ভূক্ত করিয়া মহা-হিসাব নিয়ন্ত্রক মাসিক হিসাব প্রস্তুত করেন।

উহার সহিত প্রাপ্ত প্রতিরক্ষা বিভাগের হিসাব এবং প্রাপ্ত রেল পথ বিভাগের হিসাব অন্তর্ভূক্ত করিয়া সিজিও কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারের মাসিক হিসাব প্রস্তুত করা হয়। যাহা অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগে পেশ করা হয়।

সরকারী হিসাব সংরক্ষণের নীতিমালা

প্রথমত - সরকারী হিসাব ক্যাশ ভিত্তিতে সংরক্ষণ করা হয়। অর্থাৎ যখন কোন অর্থ প্রাপ্তি ঘটে বা অর্থ প্রদান করা হয় তখনই তাহা ক্যাশ বুকে রেকর্ড করিতে **হয়**।

দ্বিতীয়ত - সরকারী হিসাবের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগে যে আয় ও ব্যয় নির্বাহ করা হয় উহার বিবরণই রেকর্ডভূক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে আয় বা ব্যয় কি উদ্দেশ্যে সংঘটিত হইয়াছে উহা হিসাবভূক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

তৃতীয়ত - মোট প্রাপ্তির ভিত্তিতে সরকারী হিসাব সংকলন করা হয়। নীট প্রাপ্তির ভিত্তিতে নহে। অর্থাৎ মোট প্রাপ্তি হইতে খরচ বাদ দিয়া নীট প্রাপ্তি বা মোট ব্যয় হইতে কর্তন বাদ দিয়া নীট ব্যয় হিসাব ভূক্ত করা হয় না।

আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব ঃ

আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা হলেন সরকারী অফিসে নিযুক্ত এমন একজন ব্যক্তি যিনি সরকারী ট্রেজারী হইতে টাকা তোলা এবং ব্যয় করার জন্য সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত। গেজেটেড কর্মকর্তাগণ তাদের বেতন ভাতার বিল নিজেরাই স্বাক্ষর করতে এবং সরকারী ট্রেজারী হতে অর্থাৎ প্রধান হিসাব রক্ষকর্মকর্তা, জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা এবং উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় হতে টাকা তুলতে পারেন। কিন্তু নন-গেজেটেড কর্মচারীগণ তাদের নিজ নিজ বিল তুলতে পারেন না। তাদের বেতন ভাতা এবং অন্যান্য প্রাপ্য পরিশোধের জন্য একজন আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার প্রয়োজন। তাছাড়া ও অফিসের বিভিন্ন

সরবরাহ ও সেবা খাতের ব্যয় মিটানোর জন্য বিল দাখিল ও নগদ টাকা উত্তোলন করা প্রয়োজন হয়। এ জন্য প্রত্যেক সরকারী অফিসে একজন আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার প্রয়োজন। আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা সরকারের পক্ষে সরকারী কর্মচারীদের বেতনভাতাতি ও সেবা খাতের যাবতীয় পাওনাদি পরিশোধের দায়িত্ব পালন করবেন।

আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তাগণ সরকার তহবিল হতে অর্থ ব্যয় বা অর্থ ব্যয়ের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক কর্মকর্তাই অর্থ ব্যয়ের সাধারণ নীতিমালা অনুসরণ করবেন।

আর্থিক ব্যবস্থাপনায় একজন আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে সর্তকর্তা অবলম্বন আবশ্যিক পালনীয় ঃ

১. অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেন প্রচলিত বিধি-বিধান কঠোরভাবে অনুসরন করা হয়। কোন ক্ষেত্রেই যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা না হয়।
২. সরকারী অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেককে এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে যেইরূপ সতর্কতা সাধারণ বিচক্ষণতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তি তাহার নিজস্ব অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে করিয়া থাকে।
৩. যে উদ্দেশ্যে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই তা ব্যয় করতে হবে।
৪. কোন ব্যয়ই কাজের তুলনায় বেশী বা বাজার দরের চেয়ে বেশী হওয়া উচিত নয়।
৫. কোন আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তাই এমন কোন ব্যয় অনুমোদনের জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার নিজের সুবিধার জন্য হতে পারে।
৬. অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি-বিধান, সরকারী আদেশ/নির্দেশ ইত্যাদি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।
৭. অর্থ ব্যয়ের সময় লক্ষ রাখতে হবে ব্যয়টি যেন কোন স্বীকৃত নীতি বা রীতি অনুসরণে হয়। অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি-বিধান, সরকারী আদেশ/নির্দেশ ইত্যাদি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।
৮. বাজেটে বিভিন্ন আইটেম/কোডের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থেও মধ্যে প্রকৃত ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
৯. সকল বিভিন্ন আইটেম/কোডের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে প্রকৃত ব্যয় সীমাদ্ধ রাখতে হবে।
১০. অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি ব্যতীত আর্থিক/সম্পূরক বাজেটে প্রাপ্তির প্রত্যাশায় কোন ব্যয় করা যাবে না।
১১. সকল শ্রেণীর প্রাপ্তি ও ব্যয় সঠিকভাবে শ্রেণীবিন্যাস পূর্বক যথাযথ হিসাব কোডের অধীনে দেখাতে হবে।
১২. প্রত্যেক মাসের শেষে সংশ্লিষ্ট এজি অফিসের সঙ্গে আয়-ব্যয়ের হিসাব সমন্বয় করতে হবে।
১৩. অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুততার সঙ্গে নিষ্পত্তি করতে হবে। এবং
১৪. অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুসারে হিসাব ও আর্থিক বিবরণী/রিপোর্টসমূহ নির্ভূলভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাখিল করতে হবে।

হ্যান্ডআউট ৪.৪.২ ঃ বাজেট (Budget) ও অডিট(Audit)

একটি প্রতিষ্ঠানের উন্নততর আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাজেট, হিসাব ও অডিট একে অপরের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত।

বাজেট- প্রত্যেক অর্থ বছরের জন্য একটি অনুমোদিত আয় ও ব্যয়ের হিসাব বছর শুরুর পূর্বেই জাতীয় সংসদে একটি বিবৃতি আকারে উপস্থাপন করিতে হয়। ইহাই বাজেট। সরকারী কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য অর্থায়ন করা হইয়া থাকে বাজেটের মাধ্যমে।

সরকারী ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং সরকারের কৌশলগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিশ্চিত করার লক্ষে মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামো পদ্ধতিতে বর্তমানে বাজেট প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় তিনটি প্রধান পর্যায়ে বিভক্ত, যথাঃ (১) কৌশলগত পর্যায় (২) প্রক্কালন পর্যায় এবং (৩) বাজেট অনুমোদন পর্যায়। কৌশলগত পর্যায়ে প্রথম ধাপে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে বিদ্যমান বাজেট কাঠামো হালনাগাদ করতে হয়। পরবর্তীতে অর্থ বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনাক্রমে বাজেট কাঠামো চূড়ান্ত করে থাকে। সাধারণত বাজেট প্রণয়নের কাজটি সেবা পরিদপ্তরের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে প্রধান কার্যালয় হিসাবে সেবা পরিদপ্তর করে থাকে। কাজেই এ ব্যাপারে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে।

অর্থ বিভাগ সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের **৩১** আগষ্টের মধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে বাজেট ফরম প্রেরণ নিশ্চিত করেন। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় তাহাদের অধিনস্ত অধিদপ্তর/পরিদপ্তরে ফরমগুলি প্রেরণ করেন।

প্রণীত ফরমের 'ছক' মোতাবেক যেহেতু সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের তিন মাসের খরচ সংযোজন করিতে হয়, সেই হেতু স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের পূর্বেই কতিপয় তথ্য ভিত্তিক নির্দিষ্ট 'ছক' মোতাবেক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন স্বাস্থ্য পতিষ্ঠানসমূহে নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ পূর্বক বিজ্ঞপ্তি জারীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফরমগুলি পূরণ করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য বলা হয়।

দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্যও প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে প্রাপ্ত বাজেট প্রস্তাবসমূহ খাতওয়ারী একত্রিত করিয়া অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত ফরমের নির্দিষ্ট ছক পূরণ করিয়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগে **৩১**শে অক্টোবরের মধ্যে প্রেরণ করা হইয়া থাকে।

অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত বাজেট পরীক্ষা নীরিক্ষা ও পর্যালোচনা করিয়া বিগত বৎসর সমূহের প্রকৃত খরচের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া খসড়া বাজেট সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/পরিদপ্তরে প্রেরণ করেন। উক্ত প্রথম সংস্করনে কোন প্রতিষ্ঠানের অনূকুলে কোন খাতে ঘাটতি বা কোন সমস্যা আছে কিনা এবং থাকিলে তাহার নিরসনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের বা অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের সহিত একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেন।

উক্ত আলোচনা সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অর্থ মন্ত্রণালয় সম্ভাব্য বাজেট চুড়ান্ত করে সরকারী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রী মহোদয় প্রতি বৎসর জুন মাসে জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশনে পেশ করেন। সংসদ সদস্যদের আলোচনার ভিত্তিতে বাজেট পাশ হইলে তাহা সংসদের অনুমোদনক্রমে পুঞ্জিকা আকারে প্রকাশ পূর্বক তাহা বাস্ড়বায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরে বাজেট বই বিতরন করেন।

উল্লেখ্য যে, উক্ত বাজেট প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের সংশোধিত এবং পরবর্তী অর্থ বৎসরের বাজেট সংযোজিত থাকে।

অতএব, দেখা যায় বাজেট প্রক্রিয়া তিনস্তরে বিভক্ত (১) বাজেট প্রণয়ন (২) অনুমোদন (৩) বাস্তবায়ন

সরকারী বাজেট প্রাথমিক ভাবে দুই ধরণের হইয়া থাকে-

(ক) অনুন্নয়ন বাজেট তথা রেভিনিউ বাজেট।

(খ) উন্নয়ন বাজেট তথা ডেভেলপমেন্ট বাজেট।

অনুন্নয়ন বাজেটের মাধ্যমে সরকারের প্রশাসনিক ব্যয় ও অন্যান্য অনুন্নয়ন ব্যয় মিটানো হইয়া থাকে।

উন্নয়ন বাজেটের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্য অর্থ সংস্থান করা হইয়া থাকে।

অনুন্নয় বাজেটের মাধ্যমে সরকারের যে রাজস্ব ব্যয় মিটানো হইয়া থাকে সেই রাজস্ব ব্যয়ের প্রধান খাতগুলি ঃ

(১) বেতন ও ভাতাসমূহ (কর্মকর্তা, কর্মচারীদের)।

(২) পণ্য ও সেবা, মেরামত ও সরবরাহ।

(৩) সুদ পরিশোধ (আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক)

(৪) ভর্তুকি ও চলতি স্থানান্তর।

(ভর্তুকি, সাহায্য, মঞ্জুরী, পেনশন, গ্রাচুইটি, আন্তজার্তিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদা)।

(৫) সম্পদ সংগ্রহ ও পূর্ত কাজ।

উন্নয়ন বাজেটের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়।

বাজেটের অন্যান্য প্রকারভেদসমূহ ঃ

(১) বার্ষিক অথবা দীর্ঘমেয়াদী বাজেট।

(২) একক অথবা একাধিক বাজেট।

(৩) বর্দ্ধিত, ঘাটতি বা সুষম বাজেট।

(৪) ক্যাশ বাজেট (সঠিক আয় ও ব্যয়ের হিসাবের উপর নির্ভরশীল)

(৫) ডিপার্টমেন্টাল অথবা Performance বাজেট।

(৬) ইনক্রিমেন্টাল অথবা জিরো বেজড বাজেট।

সরকারী আয়ের ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(১) কর সমূহ হতে প্রাপ্ত আয়।

(২) কর ব্যতীত প্রাপ্তি (যেমন- প্রশাসিনিক ফি, সেবা বাবদ প্রাপ্তি, ভাড়া ও ইজারা, টোল, লেভী, রেলপথ, ডাকবিভাগ)।

(৩) বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ।

(৪) অভ্যন্তরীন ঋণ ও অগ্রীম।

(৫) প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব (যেমন- জাতীয় সঞ্চয়পত্র, রাষ্টীয় প্রভিডেন্ট ফান্ড)।

উন্নয়ন কর্মসূচী অর্থায়নের উৎসসমূহ ঃ

(১) অভ্যন্তরীণ উৎস ঃ রাজস্ব হইতে সরকারের অনুন্নয়ন বাজেটের ব্যয় মিটাইবার পরে যে উদ্বৃত্ত থাকে তাহা উন্নয়ন বাজেটে স্থানান্তর করা হয়।

(২) বৈদেশিক উৎস ঃ

(ক) প্রকল্প সাহায্য

(খ) পণ্য সাহায্য

সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারী বিধিমালা যা অনুসরণযোগ্য ঃ

(১) জেনারেল ফাইন্যান্সিয়াল রুলস।

(২) ট্রেজারী রুলস।

(৩) রুলস অব বিজনেস।

(৪) সেক্রেটারীয়াল রুলস।

(৫) সার্ভিস রুলস।

(৬) সাপ্লিমেন্টারী রুলস।

ফাইন্যান্সিয়াল রুলস বা সাধারণ আর্থিক বিধি

সরকারী অর্থ লেনদেন যে সমস্ত বিধি দ্বারা পরিচালিত হয় তাকে আর্থিক বিধি বা ফাইন্যান্সসিয়াল রুলস বলে। অতি জরুরী এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক বিধিসমূহ ঃ

১. সমস্ত প্রকার সরকারী লেনদেন সংগঠিত হওয়ার সাথে সাথে হিসাব বহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। (বিধি-৪)

২. সরকারী কোন অর্থ অন্য কোথাও জমা/বিনিয়োগ করিতে অর্থ বিভাগের অনুমোদন প্রয়োজন। (বিধি-৭)

৩. সরকারী প্রাপ্তি অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা এবং হিসাবভূক্ত করিতে হইবে। (বিধি-৮)

৪. সরকার কর্তৃক নির্ধারিত খরচের খাত ব্যতীত অন্যত্র সরকারী অর্থ ব্যয় করা যাইবে না। খরচের পূর্বশর্ত দুইটি-

(ক) বাজেট বরাদ্দ (খ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরী। (বিধি-৯)

৫. খরচের যথার্থতা থাকিতে হইবে। মিতব্যয়ী হইতে হইবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করা যাইবে না। নিজের, ব্যক্তির বা ব্যক্তি গোষ্ঠীর স্বার্থের অনুকূলে খরচ করা যাইবে না। ক্ষতিপূরণ ভাতা এমনিভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে যাতে দাবীদারের লাভের উৎস হিসাবে গণ্য না হয়।

৬. বাজেট বরাদ্দের মধ্যে খরচ সীমাবদ্ধ থাকিবে। এবং যে উদ্দেশ্যে বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছে সে উদ্দেশ্যে খরচ করিতে হইবে। (বিধি-১২)

৭. নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা ব্যয় ও ভান্ডারের আভ্যন্তরীন নিরীক্ষা করিবেন। (বিধি-১৩)

৮. নিম্নদরদাতার দরপত্র গ্রহণ করিতে হইবে। তবে উচ্চ দরদাতার দরপত্র গ্রহণ করিলে কারণ উল্লেখ করিতে হইবে। (বিধি-১৯)

৯. আত্মসাৎ বা অন্যান্য কোন কারণে সরকারী সম্পত্তি খোয়া গেলে তাৎক্ষনাৎ লিখিতভাবে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে জানাইতে হইবে। (বিধি-১৩)

১০. বছর শেষে অব্যয়িত অর্থ সরকারের নিকট সমর্পন করিতে হইবে। (বিধি-১৫)

১১. বেতন ভাতা পরিশোধের জন্য বাজেট বরাদ্দ অতিক্রম করা যায়, তবে প্রশাসিনিক কর্মকর্তার অনুমোদন নিতে হইবে। (বিধি-১০৯, ১১০)

১২. ক্রয়কৃত মালামাল পরীক্ষা ও গণনাপূর্বক মঞ্জুর বহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। (বিধি-১৪৮)

১৩. বদলীজনিত কারণে ১ মাসের মূল বেতন এবং অগ্রিম ভ্রমন ব্যয় যা ৮০% এর অধিক হইবে না তা গ্রহণ করিতে পারিবেন। পরে বিল দাখিলের মাধ্যমে সমন্বয় করিতে হইবে। (বিধি-১৬১)

১৪. অর্থ ব্যয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ডি.ডি ও থাকিবেন। (বিধি-১১)।

ট্রেজারী রুলস্

ট্রেজারী বলিতে জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার অফিস, থানা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার অফিস এবং জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার সকল কিংবা যে কোন কর্ম নির্বাহের বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার অফিস, বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিস এবং শাখাসমূহ।

অতি প্রয়োজনীয় কিছু ট্রেজারী রুলস ঃ

১. বিধি অনুসারে হিসাব রক্ষণ অফিসে বিল পেশ করিয়া সরকারী একাউন্ট হইতে আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তাগণ অর্থ উত্তোলন করিতে পারেন।

২. পাওনাদারের লিখিত দাবী ছাড়া বাহক চেক দেওয়া যায় না। এসআর-৮০

৩. সরকারী চেক যে মাসে ইস্যু হইবে তার পরবর্তী ৩ মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। এসআর-৮৫

৪. মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর দিন পর্যন্ত বেতন পাবেন। এসআর-১১১

৫. বকেয়া বিল সাধারণত মাসিক বিলে উত্তোলন করা যায় না। আলাদা বিল করিতে হয়।

৬. বকেয়া দাবী ১ বছর পর্যন্ত অফিস প্রধান, ১-৬ বছর পর্যন্ত নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, ১৫ বছর পর্যন্ত মহাপরিচালক এবং তার উর্দ্ধে হইলে মন্ত্রণালয়ের মঞ্জুরী প্রয়োজন।

৭. বিল প্রণয়ন করিতে হইবে নির্ধারিত ফরমে।

৮. সমস্ত বিল কালি দিয়া প্রণয়ন ও স্বাক্ষর করিতে হইবে।

৯. বিলের টাকার অংকে সংখ্যায় ও অক্ষরে লিখিতে হইবে।

১০. বিলে ঘষামাজা এবং লেখার উপরে লেখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যদি কোন সংশোধন প্রয়োজন হয় তাহা হইলে ভুল লেখাগুলি লাল কালি দ্বারা কাটিতে হইবে।

১১. ব্যয় সম্পর্কিত শ্রেণিবিন্যাস কোডটি বিলের উপরে লিখিতে হইবে।

১২. একমাত্র বেতন বিল ব্যতীত সমস্ত বিলের সহিত মঞ্জুরী পত্রটি সংলগ্ন করিতে হইবে।

বেতন বিলের ক্ষেত্রে সাধারণ বিধিবিধান

১. কোন নতুন জায়গায় বদলি হইয়া আসিলে গেজেটেড কর্মকর্তার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী চাকরী স্থানের হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার নিকট হইতে এবং নন গেজেটেড কর্মচারীর ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অফিস প্রধানের নিকট হইতে প্রাপ্ত Last Pay Certificate ব্যতীত বেতন ও ভাতা প্রদান করা যাইবে না।

২. প্রথম নিয়োগের পর অথবা পদত্যাগ বা অবসর গ্রহণের পর পুনঃ নিয়োগের পর গবফরপধষ ঈবৎঃরভরপধঃব ড়ভ ঋরঃহবংং ব্যাতীত কোন সরকারী কর্মচারীকে বেতন ও ভাতা দেওয়া যাইবে না।

৩. চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ, অপসারণ বা মৃত্যুর ক্ষেত্রে একটি No Demand Certificate ব্যতীত সর্বশেষ বেতন প্রদান করা যাইবে না।

৪. সরকারী কর্মচারীর কোন মাসের বেতন ও ভাতা পরবর্তী মাসের প্রথম কর্ম দিবসে পাওনা হইবে।

৫. কোন মাসের প্রথম ছয়দিন যদি সরকারী ছুটির দিন হয়, যে সময়ে ব্যাংক হইতে বেতন ও ভাতা বিতরন করা হয় না তবে ছুটির পূর্বে সর্বশেষ কার্য দিবসে নন-গেজেটেড কর্মচারীদের মাসিক বেতন প্রদান করা যাইবে।

৬. বিল প্রণয়নের অব্যবহিত পরেই উহা বিল রেজিষ্টারে অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে এবং বিল রেজেষ্টারেরর নির্ধারিত স্থানে আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা তাঁহার স্বাক্ষর দিবেন।

সেবা পরিদপ্তরে বাজেট ব্যবস্থাপনা

সেবা পরিদপ্তর এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নার্সিং ও নন-নার্সিং জনবলের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে ২৭১৬ প্রধান কোডে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট প্রস্তাব করা হয় এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় হতে বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে প্রধান কার্যালয়সহ অধস্তনঃ প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সেবা পরিদপ্তর হতে বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

বাজেট বরাদ্দ রেজিষ্টারঃ

১. মন্ত্রণালয় হতে বাজেট বরাদ্দ পাওয়ার সাথে সাথে **১ম** কিস্তির অর্থ সেবা পরিদপ্তর হতে অধীস্থন প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাড় করা হয়।

২. পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠান সমূহের চাহিদা অনুযায়ী ও বরাদ্দ থাকা সাপেক্ষে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়ে থাকে।

৩. আর্থিক বছর শেষে অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যয়ের হিসাব/অর্থ সর্মপন হিসাব রক্ষণ অফিসের সাথে সংগতি সাপেক্ষে সত্যায়ন করে সেবা পরিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

৪. রেজিষ্টারের প্রথম পাতায় অফিস প্রধান/আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার একটি প্রত্যায়ন থাকতে হবে, যাতে রেজিষ্টারটি কত পাতার খোলা হলো।

৫. রেজিষ্টারের পাতায় কোড ও খাত অনুযায়ী বাজেট প্রাপ্তির সূচিপত্র প্রণয়ন করবেন।

৬. বিল দাখিলের পূর্বে নির্ধারিত কোড ব্যয়ের পরিমান বিয়োগ করতে হবে।

বিল রেজিষ্টার:

১. ব্যয় বিল হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণের সময় বিলে নাম্বার, বিলে সংক্ষিপ্ত বিবরণ, টাকার পরিমান লিপিবদ্ধ করে অফিস প্রধান/আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে।

২. হিসাব রক্ষন কর্মকর্তার কার্যালয়ে ব্যয় দাখিল এবং চেক প্রাপ্তির পর বিল রেজিষ্টারে টোকেন নাম্বার, তারিখ ও প্রাপ্ত টাকার পরিমান লিপিবদ্ধ করে অফিস প্রধান/আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা কর্তৃক রেজিষ্টারে স্বাক্ষর করতে হবে।

মজুত বহিঃ

১. প্রত্যেক অফিসে একটি বা প্রয়োজন অনুযায়ী একের অধিক মজুত বহি সংরক্ষণ করতে হবে।

২. মজুত বহির প্রথম পাতায় অফিস প্রধান/আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার একটি প্রত্যায়ন থাকতে হবে, যাতে রেজিষ্টারটি কতপাতার খোলা হলো।

৩. মজুত বহিতে সুচিপত্র মোতাবেক প্রতিটি আইটেমের জন্য আলাদা পাতা নির্ধারন করতে হবে। যাতে মালামাল ক্রয় ও সরবরাহ গ্রহণের পূর্বে মালামালের বর্ণনা, গুণগতমান ও নমুনা মোতাবেক লিপিবদ্ধ রাখতে হবে।

৪. কর্মকর্তা/কর্মচারীদেও চাহিদা পত্র মোতাবেক এবং সরবরাহ থাকা সাপেক্ষে অফিস প্রধান/আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ষ্টোর কিপার/মালামালের দায়িত্ব নিয়োজিত কর্মচারী মালামাল সরবরাহ করবেন।

ক্যাশ বহিঃ

১. TR Form-3 ফরম্যাট এ একটি ক্যাশ বহিঃ রাখতে হবে।

২. হিসাব রক্ষন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে কর্মচারীতে বেতনভাতাদি/সেবা ও সরবরাহ খাতের সমস্ত প্রাপ্ত চেকের অর্থ ও পরিশোধের বিবরণ ক্যাশ বহিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং অফিস প্রধান অর্থাৎ আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষর করতে হবে।

৩. প্রতি দিনে যে সব লেনদেন হয় তা সে দিনই ক্যাশ বহিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং ক্যাশ বহি বন্ধ করতে হবে। কর্মচারীদের মধ্যে একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির সাহায্যে যোগফলের নির্ভূলতা পরীক্ষা করবেন এবং যদি কোন ভুল পাওয়া যায় তা হলে সংশ্লিষ্ট রদবদলের ক্ষেত্রে স্বাক্ষর করতে হবে। অতপরঃ অফিস প্রধান অর্থাৎ আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষর করবেন। ক্যাশ

বহিতে কিছু ঘষে মুছে ফেলা এবং লেখা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। যদি কোন ভুল ভ্রান্তি পাওয়া যায় তা হলে ভুল লেখাটি কেটে দিতে হবে এবং দুইটি লাইনের মধ্যবর্তী স্থানে লাল কালি দিয়ে শুদ্ধ বিষয়টি লিপিবদ্ধ করতে হবে। এইরূপ প্রত্যেকটি লেখাই অফিস প্রধান/আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা স্বাক্ষর প্রদান করবেন।

সরকারী অর্থ প্রাপ্তিঃ

সরকারী অর্থ প্রাপ্তির সাথে সাথে প্রত্যেক আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা (DDO) নিম্নবর্ণিত পন্থা অবলম্বন করবেন।

১. নার্সিং কলেজ/নার্সিং ইনষ্টিটিউটসমূহ সাধারণতঃ কর ব্যতীত রাজস্ব প্রাপ্তি (ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে ভর্তি ফি, হোষ্টেল রেন্ট, টিউশন ফি, টেন্ডার সিডিউল বিক্রি ফরম, পুরাতন মালামাল বিক্রি ইত্যাদিতে বাবদ প্রাপ্ত অর্থ কর ব্যতীত রাজস্ব আয় বলে গণ্য করা হয়)।

২. সমস্ত প্রাপ্তি অবিলম্বে ক্যাশ বহিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৩. সরকারী কোষাগারে জমা করার জন্য কোন অর্থ প্রাপ্তির সাথে সাথে তাহা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে নির্ধারিত কোডে জমার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সরকারী একাউন্ট হতে অর্থ উত্তোলনের পদ্ধতি

বিধি অনুসারে হিসাব রক্ষন অফিসে বিল পেশ করে সরকারী একাউন্ট হতে আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তাগণ অর্থ উত্তোলন করতে পারেন। গেজেটেড কর্মকর্তাগণ স্বয়ং উত্তোলনকারী কর্মকর্তা হিসাবে নিজেদের বিলে স্বাক্ষর করবেন। অন্যান্যা ক্ষেত্রে আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তাগণ বিলে স্বাক্ষর করবেন। বিকল প্রণয়নের সময়ে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবেঃ

১. বিল প্রণয়ন করতে হবে নির্ধারিত ফরমে। যতদুর সম্ভব বাংলায় মুদ্রিত ফরম ব্যবহার করতে হবে।

২. সমস্ত বিল কালো কালির কলম দিয়ে লিখতে ও স্বাক্ষর করতে হবে।

৩. বিলের টাকার অংক সংখ্যায় ও কথায় লিখতে হবে।

৪. বিলের সর্বমোট টাকার অংকের সমস্ত শুদ্ধিকরণ উত্তোলনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক আদ্যাক্ষরের পরিবর্তে তারিখসহ পুনাঙ্গ স্বাক্ষর করতে হবে।

৫. ঘষা মোছা এবং লেখার উপর লেখা, যে আকারেই হোক না কেন, সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ এবং অবশ্যই পরিহার করতে হবে। যদি কোন সংশোধনের প্রয়োজন হয়, তা হলে ভুল লেখাগুলি লাল কালি দিয়ে পরিস্কারভাবে কেটে দিতে হবে এবং নির্ভুল লেখাটি বসাতে হবে এবং প্রতিটি শুদ্ধির ক্ষেত্রে উত্তোলনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তারিখসহ নামের আদাক্ষর দিয়ে স্বাক্ষর করতে হবে।

৬. ব্যয় সম্পর্কিত সঠিক আর্থিক কোড বিল ফরমের নির্ধারিত স্থানে উল্লেখ করতে হবে।

৭.একমাত্র বেতন বিল ব্যতীত সমস্ত বিলের সহিতই মঞ্জুরী পত্র সংযুক্ত করতে হবে।

কোন বিল প্রণয়নের পরেই তা বিল রেজিষ্টানে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে এবং বিল রেজিষ্টারের নির্ধারিত স্থানে আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা তার স্বাক্ষর করবেন। বিল পেশের সাথে সাথে হিসাব রক্ষন অফিস হতে যে টোকেন নম্বরটি দিবে, তা সংশ্লিষ্ট বিলে পাশে ও বিল রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। কোন বিলের বিপরীতে নগদে বা চেক মারফত যে পরিমান টাকাই পাওয়া যাক না কেন, তা প্রথমে ক্যাশ বহিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং তার পরেই টাকাটি বিতরণ করা যাবে। বেতন ও ভাতাদি বিতরণের ক্ষেত্রে একটি পরিশোধ রোল রেজিষ্টার অবশ্যই রাখতে হবে।

হ্যান্ডআউট ৪.৪.২ ঃ নিরীক্ষা (Audit)

অডিট (হিসাব নীরিক্ষা)

অডিট বলিতে আর্থিক ব্যবস্থাপনার সকল লেনদেনের পরীক্ষা নিরীক্ষা বুঝায়। বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিক পন্থায় আর্থিক নির্ধারিত নীতিমালা অনুযায়ী ব্যয়িত হইয়াছে কিনা তাহা যাচাইয়ের পদ্ধতি হচেছ অডিট।

নিরীক্ষার উদ্দেশ্য

সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং হিসাবের সঠিকতা যাচাই করা।

একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন লিপিবদ্ধ করা এবং উহার আয় ব্যয় ও আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে বিবরণী প্রস্তুত করার জন্য যাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহারা তাহাদের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন কিনা তাহা জানা এবং তাহাদের পেশকৃত হিসাব বিবরণী হইতে প্রতিষ্ঠানের কার্যফল এবং প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়াই নিরীক্ষার উদ্দেশ্য।

এই কার্য পরিচালনার দায়িত্ব সাংবিধানিকভাবে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের উপর ন্যাস্ত করা হইয়াছে। তিনি অডিট, কার্যাবলী সম্পাদন ও বাৎসরিক অডিট রিপোর্ট পেশ করেন।

সরকারী নিরীক্ষাকে প্রধানত নিম্নোক্ত দুই ভাগে ভাগ করা হয় ঃ

১. রাজস্ব প্রাপ্তি নিরীক্ষা

২. সরকারী খরচ ও লেনদেন পরীক্ষা

রাজস্ব প্রাপ্তি নিরীক্ষা

এই নিরীক্ষা কালে রাজস্ব নির্ধারিন যথাসময়ে আদায় এবং উহা সংশ্লিষ্ট খাতে জমা দেওয়া হইয়াছে কিনা যথাযথ বিধি ও পদ্ধতি প্রতিপলিত হইয়াছে কিনা দেখা হইয়া থাকে।

সরকারী খরচ ও লেনদেন পরীক্ষা

ইহা বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে নিরীক্ষা করা হয় ঃ

১. বেতন ও ভাতা বিল নিরীক্ষা

২. সরকার কর্তৃক জারীকৃত আদেশ নির্দেশ সঠিকভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে কিনা উহা নিরীক্ষা

৩. ভ্রমন ভাতা বিল নিরীক্ষা

৪. আনুষাঙ্গিক খরচ নিরীক্ষা

৫. খরচের মঞ্জুরীপত্র নিরীক্ষা

৬. মালামাল ক্রয় ও সংগ্রহের ব্যবস্থা নিরীক্ষা

৭. প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যাপারে সহায়ক বিভিন্ন রেজিষ্টারের যথার্থতা ও সঠিকতা ইত্যাদির নিরীক্ষা।

অডিটের শ্রেণীবিন্যাস

১. বিশেষ নিরীক্ষা - সরকারের অনুরোধক্রমে এবং মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর পূর্ব অনুমোদনক্রমে এই নিরীক্ষা পরিচালিত হয়।

২. আভ্যন্তরীন নিরীক্ষা - কোন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে সেই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব স্টাফ কর্তৃক এই নিরীক্ষা পরিচালিত হয়।

৩. বহিঃ নিরীক্ষা - এই নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাহিরের নিরীক্ষক কর্তৃক পরিচালিত হয়। বহিঃ নিরীক্ষা দুইভাবে বিভক্ত ঃ

- চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট কর্তৃক নিরীক্ষা
- সরকারী নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষা

অডিট পদ্ধতি

বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নয়টি অডিট অধিদপ্তরের মাধ্যমে বেসামরিক, সামরিক ও রেলওয়ে কর্মসম্পাদন করিয়া থাকেন।

ইহার নিরীক্ষাযোগ্য ইউনিট সংখ্যা ২২,৫০০টি, ৩০০টি অডিট পার্টি বাৎসরিক অডিট কাজে নিয়োজিত থাকে।

বার্ষিক অডিট কর্মসূচী অনুযায়ী অডিট দল প্রতিষ্ঠানে গমনপূর্বক প্রতিষ্ঠান প্রধান/অডিট কিংবা হিসাব শাখার প্রধান এর নিকট পরিচয় প্রদানের পর অডিট কার্য শুরু করেন।

অডিটের জন্য প্রযোজ্য বিভিন্ন দলিলাদি ষ্টাডি করার পর অডিট কালীন বিভিন্ন অনুসন্ধিৎসা বা অবজারভেশন লিখিতভাবে অফিস প্রধান, তাহার মনোনীত কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধানকে প্রদান করিয়া ২৪ ঘন্টার মধ্যে জবাব প্রদানের অনুরোধ জানান।

লিখিত জবাব প্রাপ্তির পর ইহা যাচাই বাছাই ও পর্যালোচনা পূর্বক সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে মূল পরিদর্শন প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্তির জন্য অডিটকালীন প্রস্তুতকৃত খসড়া প্রতিবেদন নিয়া অডিটের শেষ দিনে প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে অডিট টিমের আলোচনা হয়। ইহাতে আলোচনার প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখায় অনেক আপত্তি নিস্পত্তি হওয়ার সুযোগ থাকে। এবং প্রতিষ্ঠানটির উপর কি কি অডিট আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে তাহা প্রতিষ্ঠান প্রধান জানিতে পারেন এবং অডিট আপত্তি নিস্পত্তির ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন।

অনুচ্ছেদ আকারে সাজানো রিপোর্ট সাত/দশ দিনের মধ্যে অডিট টিমকে খসড়া পরিদর্শন রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট সেক্টর প্রধানের (উপ-পরিচালক) নিকট পাঠাইতে হয়। তিনি রিপোর্ট প্রয়োজনীয় সমীক্ষান্তে

অনধিক দুই সপ্তাহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিট, প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট প্রেরণ করেন। যাহাতে অনুচ্ছেদ ভিত্তিক তাহাদের মন্তব্য ও জবাব পাওয়া যায়।

গুরুত্বর অনিয়মের ঘটনাগুলো মূখ্য হিসাব রক্ষণ অফিসারের (Principal Accounts Officer) দৃষ্টি গোচর করা হয় যাহাতে তিনি সে সম্পর্কে মন্তব্য প্রদান করিতে পারেন। যে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় সেগুলি বাদ দেওয়া/মীমাংসিত বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু যেসব গুরুতর অনিয়ম একটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে মীমাংসা করা সম্ভব হয় না, সেগুলি মহা হিসাব নিরীক্ষক হিসাব নিরীক্ষা রিপোর্টের আকারে (Audit Report) রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করেন। এবং তিনি উহা সরকারী হিসাব কমটির (PAC) বিবেচনার জন্য সংসদে পেশ করেন।

নিরীক্ষা দলের নিকট উপস্থাপিত রেকর্ড পত্রাদি-

১. বরাদ্দ রেজিষ্টার ও তথ্য সংক্রান্ত নথি।

২. ক্যাশ বহি ও বিল রেজিষ্টার।

৩. টেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে নিম্নের রেকর্ড পত্রাদি-

দরপত্র নথি- দরপত্র বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশের বিপরীতে প্রয়োজনীয়

রেকর্ডপত্র

- দরপত্র বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলী।
- চাহিদা পত্র (প্রতিষ্ঠানভিত্তিক)
- সিডিউল বিক্রির রেজিষ্টার।

সিডিউল বিক্রির টাকা সঠিকভাবে জমা করার সমর্থনে প্রমানাদি।

- দরপত্র কমিটির সিদ্ধান্ত সম্বলিত তুলনামূলক বিবরণী।
- প্রশাসনিক অনুমোদনের বিপরীতে প্রয়োজনীয় কাজ পত্রাদি।
- বরাদ্দ মোতাবেক গ্রুপভিত্তিক বিভাজন অনুযায়ী কার্যাদেশ পূর্বক পত্রাদি।
- ব্যয় মঞ্জুরী প্রদানের স্বপক্ষে বিল, ভাউচারসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি।
- ঠিকাদার তালিকাভূক্ত সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র।

সংশ্লিষ্ট অফিসে ঠিকাদার নবায়ন ফি জমা দিয়ে ঠিকাদারী নবায়ন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র।

৪. লীভারেজ ক্রয় সংক্রান্ত নথি।
৫. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নথি ও চাকুরীবহি।
৬. ইক্যুইপমেন্ট ক্রয় ও মজুদ রেজিষ্টার।
৭. বেতন ভাতাদির ক্ষেত্রে-

(২) ক্যাশ বহি, রশিদ বহি, নগদান বহি।

৮. ভ্রমন ভাতা বিল।

৯. বৈদ্যুতিক বিল, গাড়ীর জ্বালানী ও মেরামত সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র।

১০. নিয়োগ সংক্রান্ত নথি।

১১. পেনশন প্রদান সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র।

১২. আয়কর ও ভ্যাট সংক্রান্ত রেজিষ্টার

১৩. বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত নতি, পূর্ত নির্মান ও সংরক্ষণ কাজের নথি।

১৪. চেকের কাউন্টার ফয়েল ও ব্যাংক ষ্টেটমেন্ট।

১৫. ইজারা সংক্রান্ত নথি।

১৬. টেলিফোন বিল।

১৭. গ্যাস, পানি ও পৌরকর পরিশোধ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র।

১৮. হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ক্ষেত্রে ইউজার ফি'র বিপরীতে প্রয়োজনীয় আয়ের হিসাব।

১৯. স্থায়ী সম্পদ রেজিষ্টার।

২০. রশিদ বহির স্টক লেজার ও ব্যবহৃত বহি।

২১. আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত সংক্রান্ত নথিএবং স্টক রেজিষ্টার।

২২. অগ্রিম রেজিষ্টার এবং সমন্বয় বিল ভাউচার।

২৩. খাতওয়ারী প্রাপ্তি ও পরিশোধ বিবরনী।

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ এবং অডিট উত্থাপিত অন্যান্য বিষয় মীমাংসার প্রাথমিক দায়িত্ব, দায়িত্ব প্রদানকারী কর্মকর্তার, অফিস প্রধানের এবং নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষের।

অডিট আপত্তি একটি জটিল ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রক্রিয়া। তবে আপত্তি উত্থাপনের সময় হইতেই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ সচেষ্ট হইলে নিষ্পত্তি দ্রুত হইতে পারে এবং সেই সাথে আপত্তির সংখ্যাওহ্রাস পায়।

অডিট আপত্তির ধাপসমূহ

১. অডিটকালীন অকুস্থলে নিষ্পত্তি

কোন ইউনিট/প্রতিষ্ঠান অডিট কালীন অডিট অনুসন্ধানকারী পত্রের প্রেক্ষিতে কোন আপত্তির যথাযথ জবাব (লিখিত) প্রদান করিলে কিংবা আপত্তি নিয়মিত করিয়া নিলে খসড়া পরিদর্শন রিপোর্টে উক্ত আপত্তি অন্তর্ভূক্ত করা হয় না।

অডিট টীম স্থানীয়ভাবে তাৎক্ষনিক ঐ সকল আপত্তি নিষ্পত্তি করিতে পারেন।

অডিটের শেষ দিন অডিট কালীন প্রস্তুতকৃত খসড়া পরিদর্শন রিপোর্ট নিয়া ইউনিট/প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে বিভিভন্ন আপত্তির উপর বিশদ আলোচনায় ও যথাযথ ব্যাখ্যায় এবং যুক্তিতে অনেক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ার সুযোগ থাকে।

আবার অডিট কালীন যেহেতু পূর্ববর্তী পরিদর্শন রিপোর্টের অমীমাংসিত আপত্তিগুলি পর্যালোচনা কারার বিধান আছে সেইহেতু বাস্তব যাচাই সংক্রান্ত আপত্তিগুলির যথাযথ তথ্য, উপাত্ত, বিধি, অনুমোদন অডিট টীমকে দেখানো হইলে অডিট টীম বাস্তবে পরীক্ষাপূর্বক আপত্তি মীমাংসার সুপারিশ করিতে পারেন।

২. অডিট অফিসে আপত্তি নিষ্পত্তি

স্থানীয় পরিদর্শন রিপোর্ট ৭-১০ দিনের মধ্যে সেক্টর প্রধানের নিকট প্রেরণ করা হয়। সেক্টর প্রধান উক্ত রিপোর্ট সমীক্ষান্তে প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ পূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট ১৫ দিনের মধ্যে জবাব প্রেরণের জন্য বলেন। উক্ত জবাবই হইল ব্রডশীট জবাব। প্রতিষ্ঠান অনুচ্ছেদ ভিত্তিক যথাযথ জবাব প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারী আদেশ, নির্দেশ, অর্থ আদায়ের প্রমানাদিসহ জবাব নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার মন্তব্যসহ অডিট অফিসে প্রেরণ করিবেন। এই জবাবের প্রেক্ষিতে যে সকল জবাব মীমাংসা করা যায় না তাহার কারণ উল্লেখ করিয়া (ফেরত মন্তব্য) পরবর্তীতে অডিটকে জানানো হয়।

এইভাবে পুনঃ জবাব ২য় দফা ও ৩য় দফা পাওয়ার পর পর্যালোচনাপূর্বক আপত্তি মীমাংসা করা হয়।

৩. সভার মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি

- দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে।

দ্বিপক্ষীয় সভার মাধ্যে সাধারণ অনুচ্ছেদগুলি আলোচিত ও নিষ্পত্তি করা হয়।

ত্রিপক্ষীয় মন্ত্রণালয়/বিভাগের যুগ্ম-সচিব/উপ-সচিব এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটিকে প্রতিমাসে অন্তত একবার মিলিত হওয়ার এবং প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন অফিস পরিদর্শন পূর্বক অডিট আপত্তি-নিষ্পত্তির যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

এই সভায় শুধুমাত্র অগ্রীম অনুচ্ছেদ (গুরুত্বর আর্থিক অনিয়ম) আলোচিত ও মীমাংসীত হয়।

৪.পাবলিক একাউন্টস কমিটিতে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি।

নির্ধারিত সময়ের পরও যখন আপত্তির জবাব পাওয়া যায় না কিংবা জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয় না তখন এবং কেবলমাত্র তখনই অডিট আপত্তি রিপোর্টে অন্তর্ভূক্তির ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এইগুলো খসড়া অনুচ্ছেদ।

সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত ১৫ সদস্য বিশিষ্ট পাবলিক একাউন্টস কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান / সংস্থা প্রধান ও মন্ত্রনালয়ের সচিবদের এবং সিএন্ডএজি ও তার অধীনস্থ বিভিন্ন অডিট অধিদপ্তরের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সংসদে পেশকৃত অডিট রিপোর্টের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন অডিট আপত্তি ও হিসাবের উপর মন্তব্য নিয়া আলোচনা করেন এবং উভয় পক্ষের গুনানী গ্রহণ করেন।

শুনানী গ্রহণকালে কোন কোন অডিট আপত্তি / অডিট মন্তব্যের জবাব কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পুনঃ জবাব প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। কখনও কখনও অডিট ও মন্ত্রণালয়কে একত্রে বিষয়গুলো পুনঃ পর্যালোচনা পূর্বক কমিটি সমীপে রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। এভাবে একটা বৎসরের আলোচিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অডিট আপত্তি ও অডিট মন্তব্যের উপর কমিটির গৃহীত

সুপারিশের ভিত্তিতে সংসদ কার্যপ্রণালী বিধি ২১১ মোতাবেক সংসদে প্রতিবেদন আকারে কমিটির সুপারিশমালা পেশ করা হয়।

অডিট আপত্তিসমূহ যথাসময়ে নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণগুলি নিম্নরূপ ঃ

১. স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ব্রডসীট জবাব সময়মত ও সঠিকভাবে প্রস্তুত না করা।

২. উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের মন্তব্য প্রদানে দীর্ঘ সুত্রিতা।

৩. উথাপিত আপত্তির সংগে জড়িত কর্মকর্তা, কর্মচারীগণকে সময়মত অবহিত না করা।

৪. ব্রডসীট জবাবের মন্তব্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের শিথিলতা।

৫. বদলীজনিত কারণে পূর্ববর্তী কর্তৃপক্ষের সময়কাল অডিট আপত্তির জবাব প্রদানে জটিলতা।

৬. স্থানীয় হিসাব শাখায় নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অদক্ষতা ও অবহেলা।

৭. সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতা অনুসরণ না করার মনোভাব।

৮. আর্থিক ক্ষমতার অতিরিক্ত খরচ।

৯. উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে নিয়মিত/ব্যায়োত্তর মঞ্জুরী গ্রহণ না করা।

১০. সঠিক সময়ে বরাদ্দ না পাওয়া।

১১. আর্থিক সংক্রান্ত সরকারী আদেশ যথাসময়ে স্থানীয় অফিসে না পৌঁছানো।

১২. উথাপিত আপত্তির সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে সময়মত অবহিত না করা।

১৩. ব্রডশীট জবাবের ফেরৎ মন্তব্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

হ্যান্ডআউট ৪.৫ ঃ জেন্ডার এবং উন্নয়ন

৪.৫.১ জেন্ডার ধারণা ও ইস্যুসমূহ

জেন্ডার এবং লিঙ্গ এর ধারণা

লিঙ্গ (Sex) হচ্ছে নারী ও পুরুষকে আলাদা করে এমন কিছু জৈবিক বৈশিষ্ট্য। নারীর এমন কিছু শারীরিক বৈশিষ্ট্য (যেমন-প্রজনন ক্ষমতা) আছে যে কারণে সে গর্ভধারণ করতে পারে ও সন্তানের জন্ম দিতে পারে।

> Source: *Gender Mainstreaming Learning & Information Packs prepared by the United Nations Development Programme -UNDP*
> http://www.peacewomen.org/assets/file/AdvocacyEducationTools/gendereglossary_migs_aug2005.pdf

উদাহরণ: নারী গর্ভধারণ করতে ও সন্তান জন্ম দিতে পারে যা পুরুষ পারে না।

জেন্ডার (Gender) জেন্ডার মানে হচ্ছে নারী ও পুরুষের সামাজিকভাবে আরোপিত বৈশিষ্ট্য, ভূমিকা, কার্যাবলী দায়িত্ব এবং চাহিদা যা একটি সময়ে একটি নির্দিষ্ট কমিউনিটির সদস্য হিসাবে নারী (Feminine) এবং পুরুষ (Masculine) হিসাবে চিহ্নিত করে একটি নির্দিষ্ট সমাজে প্রত্যাশিত আচরণ ও কার্যাবলীর উপর নির্ভর করে একজন নারী ও পুরুষ পরিচিতি লাভ করে।

> Source: Gender Mainstreaming Learning & Information Packs prepared by the United Nations Development Programme –UNDP
> http://www.peacewomen.org/assets/file/AdvocacyEducationTools/gendereglossary_migs_aug2005.pdfand
> *Concepts & Definitions prepared by the* Office of the Special Adviser on Gender Issues (OSAGI), UNhttp://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm

উদাহরণ:যেহেতু ধারণা করা হয়ে থাকে যে নারীরাই সেবামূলক প্রকৃতির অধিকারী সেহেতু নার্স বা মিডওয়াইফ পেশা গতানুগতিকভাবে নারীর পেশা হিসাবে স্বীকৃত । অন্যদিকে পুরুষদেরকে শক্তিশালী এবং আগ্রাসী ধরণের বলে তাদেরকে প্রতিরক্ষা পেশায় (পুলিশ, সেনাবাহিনী ইত্যাদি)) যোগ্য বলে মনে করা হয়।আজকাল পুরুষরাও নার্সিং পেশায় আসছেন এবং নারীরাও এমন অনেক পেশায় যাচ্ছেন (যেমন- প্রকৌশল, পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে চাকুরী ইত্যাদি) যেগুলো ঠিক নারীর জন্য নির্ধারিত সমাজ প্রদত্ত প্রথাগত ভূমিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। এসব উদাহরণ থেকে এ সত্যই স্পষ্ট হয় যে দীর্ঘদিন যাবৎ নারী যেসব পেশায় নিয়ুক্ত ছিল গত কয়েক দশকে তার ভূমিকার বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে।

জেন্ডার সাম্য (Gender Equity) ঃ জেন্ডার সাম্য হচ্ছে নারী ও পুরুষকে ন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখার একটি প্রক্রিয়া; সমাজের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের উন্নয়নের সুফল এবং দায়িত্ব প্রদান ও বন্টনের ক্ষেত্রে একটি ন্যায়ভিত্তিক অংশীদারিত্ব প্রদান করা। এর মানে হচ্ছে যাদের চাহিদার তুলনায় কম আছে তাদেরকে প্রয়োজন অনুসারে সম্পদের ভাগ দেয়া। অর্থাৎ বিশেষভাবে প্রদান করা এবং প্রয়োজনে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে নারীর সামাজিক ও ঐতিহাসিক বঞ্চনার ক্ষতিপূরণ করা। জেন্ডার সাম্য হচ্ছে জেন্ডার সমতা অর্জনের একটি প্রক্রিয়া।

Source: *CIDA's Policy on Gender Equality* (Excerpt from: *An Integrated Approach to Gender-Based Analysis*, Status of Women Canada, 2004)
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/eng/EMA-218123616-NN9

উদাহরণ: বাংলাদেশে সরকার নার্সিং এর ছাত্রদেরকে (নারী ও পুরুষ) মাসিক বৃত্তি প্রদান এবং নারী ছাত্রদেরকে আবাসিক ব্যবস্থা করে থাকে। পুরুষ ছাত্রদের ভর্তির জন্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোতে ১০% কোটার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

এই সাম্যতার ব্যবস্থা নারী ও পুরুষকে সমভাবে নার্সিং পেশার জগতে প্রবেশে উৎসাহিত করে।

জেন্ডার সমতা (Gender Equality)

জেন্ডার সমতার মানে হচ্ছে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমান সুযোগের অধিকার নিশ্চিত করা। একজন নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইন-সংক্রান্ত অধিকার লাভ; উৎপাদনমূলক সম্পদ, যেমন- শিক্ষা,ভূমি, তথ্য ও আর্থিক সম্পদের উপর নারী-পুরুষের সমান কর্তৃত্ব অর্জন; পরিবার, সমাজ এবং জাতীয় পর্যায়ে সম্পদ বিনিয়োগ ও বন্টন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার অধিকার অর্জন জেন্ডার সমতার অন্তর্ভুক্ত।

Source: *CIDA's Policy on Gender Equality* (Excerpt from: *An Integrated Approach to Gender-Based Analysis*, Status of Women Canada, 2004)
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/eng/EMA-218123616-NN9

উদাহরণ: বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদ বলা হয়েছে: "কেবল ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।" আরও বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র গণজীবনের সর্বস্তরে নারীগণ পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

অতীতের বৈষম্যসমূহ দূর করার জন্য সরকার তার জনগণ (পুরুষ, নারী এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী) এর জীবন মান এবং চাহিদা অনুযায়ী কোটা পদ্ধতির প্রচলন করেছে। উদাহরণস্বরূপ মুক্তিযোদ্ধা ও তার সন্তানদের জন্য ৩০% কোটা, নারীদের জন্য ১০% কোটা, বিভাগীয় কোটা ১০% এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য ৫% কোটা এবং নারী কর্মীদের জন্য ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটির প্রবর্তন করেছে।

জেন্ডার ভূমিকা (Gender Roles):

জেন্ডার ভূমিকা বলতে বোঝায় সমাজে নারী-পুরুষের প্রচলিত ভূমিকা (দায়িত্ব, কর্তব্য, পছন্দ, আশা-আকাঙ্খা ইত্যাদি) চিরায়ত নিয়ম অনুযায়ী তুলে ধরা। জেন্ডার ভূমিকাগুলো হচ্ছে (১) উৎপাদনমূলক ভূমিকা (Productive Role)(২) পুন:উৎপাদনমূলক ভূমিকা (Reproductive Role)(৩) সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা (Community Managing Role) এবং (৪) সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা (Community Politics Role)।

Source: *USAID, Gender Terminology*
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADL089.pdf

উদাহরণঃ বাংলাদেশে Family Welfare Assistant (FWA)-রা সাধারণতঃ নারী আর Health Assistant (HAs)-রা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পুরুষ। পুরুষরা Community based Birth Attendants (CSBAs) হিসাবে কাজ করার অনুমতি পায় না। শুধুমাত্র নারীদেরকে এই ভূমিকায় গণ্য করা হয়।

জেন্ডার চাহিদা (Gender Needs):

নারী ও পুরুষের পৃথক চাহিদা ও স্বার্থসমূহ নির্ধারিত হয় বিরাজমান জেন্ডার ভূমিকা ও জেন্ডার স্বার্থ দ্বারা।

বাস্তবসম্মত জেন্ডার চাহিদা (Practical Gender Needs)|

বাস্তবসম্মত জেন্ডার চাহিদা হচ্ছে নারী-পুরুষের মৌলিক ও তাৎক্ষণিক প্রয়োজন বা চাহিদার সাথে সম্পর্কিত; যেমন- খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ পানি, শিশু শিক্ষা ইত্যাদি।

বাস্তবসম্মত চাহিদা পূরণের কর্তৃত্ব এর মধ্যে তাদের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের জন্য সমাজ নির্ধারিত ভূমিকা দায়-দায়িত্ব আচরণ ও বিশ্বাসের কোন মৌলিক পরিবর্তন হয় না।

Source: *CIDA's Policy on Gender Equality*
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/eng/EMA-218123616-NN9

উদাহরণঃ নারীদের জন্য নিরাপদ মাতৃত্বকালীন সেবা প্রদানের জন্য সরকার "মিড ওয়াইফ" দের সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্যে একটি কৌশল গ্রহণ করেছে। এর জন্য উচ্চমানের যথেষ্ট সংখ্যক এবং স্থায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে ২০১৫ সালের মধ্যে ৩০০০ মিড-ওয়াইফ কে তৈরী ও কর্মে অধিষ্ঠিত হবার সুযোগ সৃষ্টি হবে। (NES OP, HPNSDP, July 2011-June-2016)।

কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা/স্বার্থ (Strategic gender needs/interests)

কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা হচ্ছে সমাজে নারী-পুরুষের তুলনামূলক (অধস্তনঃ) অবস্থা তুলে ধরা। এর মধ্যে রয়েছে, আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক অধিকারঅর্জন, মজুরী বৈষম্য কমিয়ে আনা এবং পারিবারিক সহিংসতা থেকে রক্ষা করা, সিদ্বান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভূক্তকরণ এবং নিজের শরীরের উপর অধিকার।

Source: *CIDA's Policy on Gender Equality*
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/eng/EMA-218123616-NN9

জেন্ডার মূলধারাকরণ (Gender Mainstreaming): উন্নয়ন, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতার বিয়ষটি অন্তর্ভূক্ত করার একটি কৌশল হচ্ছে জেন্ডার মূলধারাকরণ। যেমন- উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচীর পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ (Monitoring) ও মূল্যায়ন এবং সকল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে নারী-পুরুষের সমতার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা।

Source: *UN Economic and Social Council (ECOSOC), 1997*
http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/factsheet1.pdf

হ্যান্ডআউট ৪.৫.২ (ক) ঃবিশ্বব্যাপী ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীর প্রতি সহিংসার চিত্র

বিশ্বব্যাপী (Global)ঃ

বিশ্বব্যাপী এক তৃতীয়াংশ নারীর স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয় শারীরিক বা যৌন সহিংসতা থেকে। এ ধরনের সহিংসতার ফলশ্রুতিতে হাড় ভাংগা থেকে শুরু করে মাতৃত্বজনিত জটিলতা, মানসিক সমস্যা এবং সামাজিক ভাবে হেয় হওয়া ধরণের অভিঘাত (Impact) হতে পারে।অন্ততঃ শতকরা ৩৫ ভাগ নারী বিশ্বব্যাপী একান্ত ঘনিষ্ঠ সংগী (patner) বা পরিচিতি সংগী (non patner) দ্বারা নির্যাতিত হয়ে থাকে। ঘনিষ্ঠ সংগী দ্বারা নির্যাতিত হওয়া খুব গতানুগতিক (common) ধরণের এবং শতকরা ৩০ ভাগ নারী এভাবেই নির্যাতিত হয়ে থাকে।

মৃত্যু এবং জখম/আহত হওয়া: সারা বিশ্বে খুন হওয়া নারীদের ৩৮%-ই ঘটে ঘনিষ্ঠ সংগীর দ্বারা। আবার শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়া ৪২% ঘটনাই ঘটে ঘনিষ্ঠ সংগীর দ্বারা।

বিপদগ্রস্ত: বিপদগ্রস্ত নারীদের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ সংগীর দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েছে তাদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ।

নেশাগ্রস্তঃ নেশাগ্রস্ত নারীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংগীর দ্বারা নির্যাতিত নারীর সংখ্যা দ্বিগুন।

যৌন সংক্রামিত রোগঃ যে সমস্ত নারী শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে তাদের মধ্যে যৌন সংক্রামিত রোগ সাধারণ যৌণ সংক্রামিত রোগীর চেয়ে দেড় গুণ বেশি।

অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণ এবং গর্ভপাতন: ঘনিষ্ঠ সংগী/স্বামী বা অন্য কারো দ্বারা যৌন নির্যাতন এর শিকার হওয়া নারীর অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণ এবং গর্ভপাতন এর সংখ্যা সাধারণ নারীর যার এ ধরণের নির্যাতন ছাড়াই গর্ভপাতন হয়েছে তার দ্বিগুন।

স্বল্প ওজনের শিশুর জন্ম হওয়া: নির্যাতিত নারীর স্বল্প ওজনের শিশুর জন্মদানের আশঙ্কা সাধারণ নারীর চেয়ে ১৬% বেশী।

ঘনিষ্ঠ সংগীর দ্বারা নির্যাতন এর আঞ্চলিক এলাকাসমূহ (আঞ্চলিক উপাত্ত (WHO)[১])

- দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ৩৭.৭% ব্যাপকতা (বাংলাদেশ, পূর্ব তিমুর, ভারত, মিয়ানমার, শ্রীলংকা এবং থাইল্যান্ড থেকে সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে) East Mediterranean এ ৩৭% ব্যাপকতা (মিশর, ইরান, ইরাক, জর্ডান ও প্যালেষ্টাইন হতে প্রাপ্ত উপাত্ত অনুযায়ী)।
- আফ্রিকা: ৩৬.৬% ব্যাপকতা (বৎসোয়ানা, ক্যামেরুন, কঙ্গো, ইথিওপিয়া, কেনিয়া, লেসোচথা, নাইজেরিয়া, মালাওই, মোজাম্বিক, নামিবিয়া, রোয়ান্ডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, সোয়াজিল্যান্ড, উগান্ডা, তাঞ্জানিয়া, জাম্বিয়া ও জিম্বাবুয়ে হতে প্রাপ্ত উপাত্ত অনুযায়ী)।

---

[1]WHO, *Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence*, News Release: 20 June 2013, Geneva. http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/violence_against_women_20130620/en/

অন্যান্য সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী চিত্র:[২]

- লিঙ্গ- নির্বাচিত গর্ভপাত (Abortion), শিশু হত্যা (Infanticide), অবহেলা অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে অপুষ্টির শিকার অথবা স্বাস্থ্য সেবায় অভিগম্যতার (access) অপ্রতুলতার কারণে বছরে ছয় কোটি মেয়ে শিশু যাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ছিল তারা মারা যায়। (UN Study on the Status of Women, 2000)।
- বিশ্বব্যাপী তিনজনের মধ্যে একজন নারী এবং কন্যাশিশু মার খায় বা যৌন সহিংসতার শিকার হয় তার জীবদ্দশায় (UN Comission on the status of women)
- চল্লিশ লক্ষ নারী এবং কন্যা শিশু বছরে পাচার হয় (জাতিসংঘ)। দরিদ্র নারী এবং কন্যা শিশুরাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পুরুষদের যৌন নির্যাতনের স্বার্থে এ ধরনের পাচারের শিকার হয়।
- প্রতি বছর ২০ লক্ষ কন্যা শিশু যাদের বয়স ৫ থেকে ১৫ বছর বাণিজ্যিক যৌন শিল্পে অন্তভুর্ক্ত হয়।
- কমনওয়েলথ এর এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে স্বামী/ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি দ্বারা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হওয়া শতকরা ৯২ ভাগ নারী এ বিষয়টি চিকিৎসকদের কাছে প্রকাশ করে না।
- জাপানের শতকরা নয় ভাগ এবং পেরুর শতকরা বায়ান্ন ভাগ নারী চড় থাপ্পর, মারধোর ধরনের সহিংসতার শিকার হয় (WHO Multi-Country Study in Women's Health and Domestic Violence Against Women, 2005)|
- যৌন নির্যাতনের হার দেশ থেকে দেশে বিভিন্ন ধরনের হয়। স্বামী/ঘনিষ্ঠ সংগী দ্বারা ধর্ষনের শিকার হয় সার্বিয়া ও মনটেনগ্রোতে শতকরা ছয় জন নারী, বাংলাদেশে থেকে শতকরা ৪৬ ভাগ নারী এবং ইথিওপিয়াতে শতকরা ৫৯ জন নারী (WHO Multi-country studty in Women's Health and Domestic Violence Against Women, 2005)।
- পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে ইউরোপে প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন নারী সহিংসতার শিকার। (Family Violence Prevention Fund, www.endabuse.org)|
- যুদ্ধকালীন বা গৃহযুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের মনোবল ভেঙ্গে দেবার জন্য সাধারণ নারী ও কন্যাশিশুদের উপর বিশেষ ধরনের নির্যাতন করা হয়। এ ধরনের সহিংসতার শিকার হওয়া নারীরা প্রথমত নিজে নির্যাতিত হয় এবং পরবর্তীতে এর ফলশ্রুতিতে পরিবার এবং সমাজ কর্তৃক নিগৃহীত হয়।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৯৮ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে প্রতি ছয় জন নারীর মধ্যে একজন ধর্ষনের জন্য আক্রমণ বা পুরোপুরি ধর্ষনের শিকার হয়।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শারীরিক নির্যাতনের (চড়, থাপ্পর, কিল-ঘুষি, কোন বস্তু দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত ইত্যাদি) শিকার ১০০ জন নারীর মধ্যে মাত্র একজন তা প্রকাশ করে। প্রতি নয় মিনিটে একজন নারী এই বিশ্বে তার ঘনিষ্ঠ সংগী দ্বারা নির্যাতিত হয়।
- ফ্রান্সে সহিংসতার শিকার জনগনের মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগই নারী। এর মধ্যে শতকরা ৫১ ভাগই তাদের স্বামী দ্বারা নির্যাতিত।
- ইউরোপীয়ান ইউনিয়নে শতকরা ৮৫ থেকে ৮১ ভাগ কর্মজীবি নারী তাদের কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির শিকার হয়।

---

[2]Dr, Abul Hossain, *Institutional approach to combat violence against women in Bangladesh*, Multi-sectoral Prog for VAW, Ministry of Women and Children Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh, December 2007

ভারতের একটি সমীক্ষা[3] "নার্সদের প্রতি পারিবারিক সহিংসতা" পরিচালিত হয়। এতে দেখা যায় যে শতকরা ৬০ ভাগ নার্স গর্হিত আচরণ, শতকরা ৬৫ ভাগ মানসিক নির্যাতন, এবং শতকরা ৩০ ভাগ যৌন নির্যাতনের শিকার হয় তাদের বৈবাহিক সংগী/স্বামী দ্বারা। এদের মধ্যে শতকরা ৫৮ ভাগ বলেন যে এই নির্যাতনের কোন কারণ যৌক্তিক না, শুধুমাত্র দাম্পত্য বিশ্বাসভঙ্গতা ছাড়া (৩১.৬৭%)। যারা শারীরিকভাবে বা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তাদের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ আহত হয়েছেন এবং শতকরা ৫৬.৭ ভাগ বলেছেন তারা শারীরিক এবং মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। (Sharma KK, Vasta M, Domestic Violence against Nurses by their Marital Partners: A Facility based study at a Tertiary Care Hospital, College of Nursing, All India Institute of Medical Sciences New Delhi India)

বাংলাদেশ

Human Rights Watch World Report2013 অনুযায়ী ২০১২ সালে বাংলাদেশের সামগ্রিক মানবিক অধিকার এর অবস্থা/চিত্র অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। নারী এবং কন্যাশিশুর অধিকার এর বিষয়ে বলা হয়েছে যে যদিও এ বিষয়ে বাংলাদেশে যথেষ্ট মজবুত আইন এবং জুডিশিয়াল গাইডলাইন আছে কিন্তু এর প্রয়োগ খুবই অপ্রতুল। বাংলাদেশে কন্যা শিশুর বিবাহ এর ঘটনা বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক। মুসলিম, হিন্দু, খ্রীষ্টানদের পুরানো এবং বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন দ্বারা নারীরা ক্ষতিগ্রস্থ হয় যখন তারা স্বামী পরিত্যক্ত, তালাকপ্রাপ্ত হয় অথবা তাদেরকে বিয়ের জন্য আক্রান্ত/বাধ্য করা হয়। বাংলাদেশে Law Commission গবেষনা করে ২০১২ সালে এই আইনগুলোর পরিবর্তনের সুপারিশ করেছে। (Human Rights Watch[4] World Report 2013).

VAW data for 2009-2011

Year	Acid throwing	Abduction	Rape	Murder after rape	Murder	Injured	Dowry	Others
2009	100	2772	2900	39	139	94	4061	2693
2010	97	3391	3328	25	176	120	5331	3768
2011	88	4109	3638	28	280	139	7079	4528
Total	285	10272	9866	92	595	353	16471	10989

Source: Police Headquarter

[3]Sharma KK, Vatsa M. *Domestic Violence against Nurses by their Marital Partners: A Facility-based Study at a TertiaryCareHospital.* College of Nursing, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, India
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22090678

[4]Human Rights WatchWorld Report 2013- Bangladesh Chapter,http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/bangladesh

Bhuiyan A, Sharmin T, Hanif S. এর স্টাডিতে[৫] (বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জরীপ করা হয়) স্বামী দ্বারা শারীরিক ভাবে নির্যাতিত নারী সংখ্যা শতকরা ৩০ থেকে ৫০ ভাগ পর্যন্ত দেখা যায়।

- ৫০.৮% নারী স্বামী দ্বারা, ২.১% অন্যান্য পারিবারিক সদস্য এবং ৫.২% স্বামী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্য দ্বারা শারীরিক নির্যাতনের শিকার।
- গর্ভকালীন সময়ে ২০% নারী স্বামী দ্বারা এবং ২.৬% নারী অন্যান্য পারিবারিক সদস্য দ্বারা নির্যাতিত হয়।
- শারীরিক নির্যাতনের শিকার ৪৭% নারী মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং ৭৮.৩%-কে চিকিৎসা সেবা নিতে হয়।
- নারীরা কেন নির্যাতন সহ্য করে সংসারে থাকে তার কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে, যদি চলে যায় তবে সন্তানেরা কষ্ট পাবে (৩২.১%), আর কোথাও চলে যাবার জায়গা নাই (১২.৭%), এবং সামাজিকভাবে নিগৃর্হিত হবার ভয় পায় (১২.২%)।
- The World Bank Survery "Whispers to Voices" on Gender Norms, 2008 এর সমীক্ষায় দেখা যায় যে ৪৫-৬০ বছর বয়সী শতকরা ২৪ ভাগ নারী এবং ১৫-২৫ বছর বয়সী শতকরা ৩০ ভাগ নারী জীবনের কোন না কোনো সময় স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছে। এর বিপরীতে পরিবারে পুরুষ প্রধানদের মধ্যে শতকরা ৪৩ ভাগ স্বীকার করেন যে তারা তাদের স্ত্রীকে আঘাত করেছেন। এক তৃতীয়াংশ নারী মনে করে যে সংসারের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন না করলে স্বামী দ্বারা নিগৃহীত হওয়াটা তেমন কোন ব্যাপার নয়।
- বিশ্ব ব্যাংক এর একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, যে পরিবার মেয়ের বিয়েতে যৌতুক প্রদান করে থাকে, তাদের মেয়েরা অধিকতর নির্যাতনের শিকার হয়।
- আই সি ডি ডি আর বি[৬]- নারীপক্ষের একটি সমীক্ষার প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী শহর এলাকার শতকরা ৩৭.৪ ভাগ নারী এবং গ্রামীণ এলাকার শতকরা ৪৯.৭ ভাগ নারী জীবনের কোন না কোন সময়ে স্বামী দ্বারা নির্যাতিতা হয়েছে।
- শহরকেন্দ্রিক শতকরা ৭৫ ভাগ নারী এবং গ্রামভিত্তিক শতকরা ৮৬ ভাগ নারী তার নির্যাতনের ঘটনা কারো কাছে প্রকাশ করে না।

---

[5] Bhuiya A, SharminT, Hanif S. *Nature of domestic violence against women in a rural area of Bangladesh : Implication for preventive interventions.J Health Pop Nutr 2003;2:48-54*
http://www.jhpn.net/index.php/jhpn/article/view/184/179

[6]WHO Multi Country Study on women's health and domestic violence against women: Initial results prevalence, health outcomes and women's responses. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2005
http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en /)

The Bangladesh Demographic and Health Survey conducted by NIPORT asked currently married men for information on violence against their wives. They were asked if they thought it was justified for a husband to beat his wife in the following four situations: if she goes out without telling him, if she neglects the children, if she argues with him and if she fails to provide food on time. Overall more than half **(55%)** of the men agreed that at least one of these factors is sufficient justification for wife-beating. The most widely accepted reason for wife-beating is a wife going out without informing her husband. (NIPORT, 2005: 45).

[***quoted from Policy Briefs and Handouts on Gender Equality and Women Empowerment,2013, Building accountability to Women through Women Parliamentarians (WP) Project, Bangladesh Parliament Secretariat and Un Women***]

- Results of a BRAC study by Hadi reported that the prevalence of physical violence against participating women was 19 percent compared to 40 percent among non participating eligible members. (Hadi A. Women's productive role and marital violence in Bangladesh, J Family Viol 2005:20:181-9.)

হ্যান্ডআউট ৪.৫.২ (খ) ঃ কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন/সহিংসতা

সংজ্ঞা

কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন/সহিংসতা হচ্ছে-

- যখন একজন নারী কর্মী তার কর্মক্ষেত্রে বা যাতায়তের পথে সহিংসতা, নির্যাতন, হুমকি বা হামলার শিকার হয় এবং ফলশ্রুতিতে তার নিরাপত্তা, ভালো থাকা বা স্বাস্থ্যের জন্য এই বিষয়টি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দেয়। (ইউরোপীয়ান কমিশন)
- কর্ম পরিবেশে একজন বা একাধিক ব্যক্তির প্রতি শক্তি প্রয়োগের ইচ্ছা, হুমকি দেয়া বা সহিংসতা ঘটানো, যার ফলে সাংঘাতিকভাবে আহত হওয়া, মৃত্যু, মানসিক সমস্যা বা এর অবনতি, পদাবনতি বা অধিকার বঞ্চিত হবার মত সম্ভাবনা দেখা দেয় বা ঘটে থাকে। (WHO)

নির্যাতিতা/ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি (*Victim*) : যিনি নির্যাতন এর শিকার হন।

অপরাধী (*Perpetrator*) : যিনি অপরাধ/নির্যাতন সংঘটিত করেন।

স্বাস্থ্য খাতের কর্মক্ষেত্র (Work place in Health Sector):

- যে কোন ধরনের স্বাস্থ্য সেবার সুবিধা (পাবলিক/প্রাইভেট, আকার/আয়তন, স্থান (গ্রাম বা শহরকেন্দ্রিক), সেবার ধরন, বড় শহরগুলোর রেফারেন্স হাসপাতালসমূহ, আঞ্চলিক এবং বিভাগীয় হাসপাতাল, কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র/ক্লিনিক, পুনর্বাসন কেন্দ্র ইত্যাদি।
- প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার ডাক্তারদের অফিস/চেম্বার
- ডায়াগনষ্টিক সেন্টার
- স্বাস্থ্যখাত কেন্দ্রিক পাবলিক বা প্রাইভেট অফিসসমূহ অধিদপ্তর/পরিদপ্তরসমূহ
- স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের বাইরের যে কোন ধরনের স্বাস্থ্য সেবা, যেমন- এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস বা হোম কেয়ার (প্রাইভেট বাড়ীতে)।

বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন

(১) শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন

যেহেতু শারীরিক নির্যাতন মানসিক নির্যাতনের মতো দৃষ্টিগোচর হয় না, সেহেতু কর্মক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতনই শুধু স্বীকৃত। ব্যক্তিগত মানসিক নির্যাতনকে তেমন বড় করে দেখা হয় না। কিন্তু এ ধরনের নির্যাতন যদি বারংবার ঘটতে থাকে তাহলে এটা ধীরে ধীরে ভয়ানক রূপ ধারন করতে এবং নির্যাতিতা/ক্ষতিগ্রস্থ (*Victim*) এর উপরে একটা বড় রকম প্রভাব ফেলতে পারে। বর্তমানে মানসিক নির্যাতনকেও কর্মক্ষেত্রে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা চলছে।

এক ব্যক্তি বা দলকে পেশীশক্তি দ্বারা আঘাত করা যার ফলশ্রুতিতে শারীরিক, যৌন বা মানসিক ক্ষতি সাধিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে আঘাত বা মারধর করা, আগুণ, এসিড বা দাহ্য পদার্থ দ্বারা দগ্ধ করা, শ্বাসরোধ করা বা অন্য কোনভাবে হত্যা করা, ইত্যাদি।শক্তির ব্যবহার, ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি। এর ফলে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে আঘাত লাগে বা মানসিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ করে। কার্যতঃ দেখা যায় যে শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন যুগপৎ (*overlap*) ঘটে থাকে।

(২) বলপ্রয়োগে বা ভয় দেখিয়ে কাউকে কিছু করতে বাধ্য করা (*Bullying / mobbing*)

অনভিপ্রেত আচরণ যা বারবার এবং বিভিন্ন সময়ে ঘটানো হয় এবং একজন ব্যক্তি বা দলগতভাবে কয়েকজনের প্রতি হিংস্র/আক্রমানাত্মক কোন কিছু করার উদ্যোগ নেয়, যা সেই ব্যক্তিদের সম্মানহানি এবং অপদস্ত করে।

আরো কিছু আচরণ এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

- যাদের সম্ভাবনা আছে অধিক ভালোভাবে কাজ করার তাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলা হয়।
- যারা দক্ষ তাদেরকে ক্রমাগত খুঁত অনুসন্ধান করে, তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করে বা বাজে ধরনের / অপ্রয়োজনীয় কাজে নিযুক্ত করা।
- দায়িত্ব অর্পনে অস্বীকার করা কারণ তারা অন্যদেরকে বিশ্বাস করতে পারে না।
- কাজ করানোর জন্য কর্মীদেরকে চিৎকার করে তিরষ্কার করা।
- ব্যক্তিগতভাবে বা সকলের সামনে খুঁত ধরা বা সমালোচনা করা।
- নিজের পছন্দমতো কার্য প্রক্রিয়া চাপিয়ে দেয়া।
- প্রত্যাশিত পদোন্নতি/প্রমোশন না দেয়া/বা পাবার ক্ষেত্রে বাঁধাগ্রস্ত করা ।
- ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে একজনকে বেশী কাজ দিয়ে কম সময় দেয়া, যাতে করে সে সময়মতো কার্য সম্পাদন করতে না পারে।
- অদক্ষ প্রতিপন্ন করে একজনের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলার পুনঃ পুনঃ চেষ্টা, যাতে করে তাকে চাকুরীচ্যুত করতে বাধ্য করা হয় বা সে নিজে টিকতে না পেরে চলে যায়।

(৩) অপদস্থ/হয়রানি করা (Harassment)

যে ধরনের আচরণ বয়স, অক্ষমতা/বিকলঙ্গতা Disability, এইচআইভি এইডস আক্রান্ত অবস্থা, পারিবারিক অবস্থা/অবস্থান, সেক্স, সেক্স এর ধরণ, জেন্ডার ভিত্তিক কাজকর্ম, জাতি, গোত্র, বর্ণ ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক, ট্রেড ইউনিয়ন, নিজস্ব বিশ্বাস, জাতীয় এবং সামাজিক উৎপত্তি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, সম্পদ, জন্ম অথবা অন্য অবস্থানকে হেয় প্রতিপন্ন করে এবং একজন ব্যক্তি / ব্যক্তিবর্গের মহিলা বা পুরুষের মর্যাদা হানি করে। (*Human Rights Act, UK*)

(৪) যৌন নির্যাতন (*Sexual Harassment*)

অনাকাঙ্খিত / অনাভিপ্রেত যৌন হয়রানিমূলক আচরণ যা একজন ব্যক্তিকে ভীতি, অসম্মানিত, অস্বস্তি বা লজ্জায় ফেলা, মানসিক দুশ্চিন্তা অথবা অসুবিধার সৃষ্টি করে।

(ক) ব্যক্তিগত নির্যাতন ঃ

শারীরিক:

- অনভিপ্রেত এবং ইচ্ছাকৃত শারীরিক স্পর্শ (যেমন, চিমটি কাটা, স্পর্শ করা, হাত বুলানো, ধাক্কা দেয়া, টেনে আনা, চুম্বন করা, ঘষে দেয়া ইত্যাদি)।
- অনাকাঙ্খিতভাবে ঘনিষ্ট হয়ে বসা।
- অতি নিকটবর্তী হয়ে কিছু দেখানো।

মৌখিক :

একজনের শারীরিক সৌন্দর্য, দৃষ্টিগোচরতা (*Appearance*), ফিগার ইত্যাদি নিয়ে কথা বলা / কৌতুক করা ।অশালীন ফোন কল ।

যৌনতা ধরনের কৌতুক করা ।

অনাভিপ্রেতভাবে শরীরের বিভিন্ন অংগের প্রশংসা করা ।

নাম ধরে ডাকা ।

ইশারাঃ

হাত, আঙ্গুল, পা, বাহু বা চোখ দিয়ে শারীরিক অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে যৌনতা প্রকাশ পায় এ ধরনের আচরণ করা ।

লিখিতঃ

অশালীন চিঠি, ই-মেইল বা মেসেজ পাঠানো ।

(খ) কর্মক্ষেত্রে অশালীন আচরণ আরো হতে পারে-

- যৌন সংগ লাভের জন্য চাকরীর উন্নতি, প্রমোশন ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংগীকার করা ।
- যৌন সংগ এর বিনিময়ে চাকরী প্রদান করা ।
- যৌন সংগে রাজী না হলে চাকুরীচ্যুত করার ভীতি প্রদর্শন
- যৌন সংগ প্রদান না করলে কর্মক্ষেত্রে জীবন অতিষ্ঠ করা ।

(গ) শত্রুতামূলক / আক্রমানাত্ম পরিবেশ তৈরী করা (যখন যৌনতামূলক আচরণ কর্মক্ষেত্রে একটি অসুস্থকর পরিবেশ তৈরী করে)

বিভিন্ন ধরনের যৌনতামূলক ছবি, কার্টুন, গ্রাফিকস, পর্নোগ্রাফিক ম্যাটারিয়ালস, ফটোগ্রাফ বা ইন্টারনেট ইমেজ প্রদর্শন করা বা ঝুলিয়ে রাখা ।

যৌনতামূলক/অশালীন কৌতুক বলা ।

অশালীন ভাষা ব্যবহার করা ।

(ঘ) সাম্প্রদায়িক হয়রানিঃ

সম্প্রদায়/জাতি/গোত্র, বর্ণ, ভাষা, জাতিগত সূত্র, ধর্ম, ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠী, জন্মগত বা অন্যান্য অবস্থান নিয়ে ভয়/হুমকি প্রদর্শন যা একজন নারী/পুরুষকে তার কর্মক্ষেত্রের সম্মানজনক আসন থেকে বিচ্যুত করে ।

(ঙ) ভয়-ভীতি প্রদর্শনঃ শারীরিক বা অবস্থানগত শক্তি খাটানো ।

স্বাস্থ্য সেবা খাতে যে সমস্ত বিষয়গুলো হয়রানিমূলক অবস্থা তৈরী / বৃদ্ধি করতে পারে-

জেন্ডার	:	অধিক হারে নারী কর্মী (নার্স)
সম্প্রদায়িক/জাতি	:	মাইনরিটি দল থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মী (যেমন ধর্মীয়/নৃগোষ্ঠী)
রুগী	:	মানসিক আক্রান্ত ড্রাগ বা মদ দ্বারা আসক্ত রুগী এবং রুগী ও সেবা প্রদানকারী ব্যক্তিদের মধ্যে অবিশ্বাস বা কমিউনিকেশন গ্যাপ সৃষ্টি।
পরিবেশ	:	বাতি/আলোর ব্যবস্থা, নিরাপত্তার অভাব, আক্রমন করা যায় এমন ধরনের জিনিস/ইক্যুইপমেন্ট এর সহজলভ্যতা।
সংস্থা	:	পদ অনুযায়ী কম কর্মী, অধিক কাজের চাপ, কর্মীদের মধ্যে অসুস্থকর সম্পর্ক, সীমিত তত্ত্বাবধানের সহায়তা, একাকী রুগীর সেবা করা, কর্মক্ষেত্রে তাৎক্ষনিক পরিবর্তনসমূহ কর্মস্থলে একটি আক্রমনাত্মক ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করা।
কমিউনিটি/সমাজ	:	কমিউনিটিতে মারাত্বক পর্যায়ে আইন শৃঙ্খলার অবনতি, সম্পদের অপ্রতুলতা, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, সামাজিক মূল্যবোধের অভাব ইত্যাদি কর্ম পরিবেশকে প্রভাবিত করতে পারে।

কর্মক্ষেত্রে সহিংসতার ফলাফল

- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে শারীরিক বা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করতে পারে।
- ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি এ অভিজ্ঞতা থেকে শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে আক্রান্ত হতে পারে। এর প্রভাবে সেই ব্যক্তি রাগান্বিত, হতাশাগ্রস্থ, ভীত সন্ত্রস্ত হতে পারে এবং মারাত্মক ঘুম ব্যহত হতে পারে।
- একজন কর্মীর পেশাগত উন্নতি ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে। (যারা ক্রমাগত সহিংসতার শিকার, তারা নিজেরাই চাকরি ছেড়ে দিতে পারে)।
- কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা/নির্যাতন দ্বারা একজন কর্মী, তার পরিবারবর্গ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর ফলে বড় অংকের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটতে পারে।
- কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে গুণগত/মানসম্পন্ন সেবা প্রদানে বিপর্যয় ঘটাতে পারে।
- কর্মীর পেশাগত জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে। (চাকুরী প্রদান, পদাবনতি, চাকুরীচ্যুত, পদোন্নতি, শৃঙ্খলা বিধান, সাসপেনশন, বদলী, অনাকাঙ্খিত কর্ম প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে)

কোন বিষয়গুলো সহিংসতা নয়: সাধারণ দুষ্টামী (*teasing*), বন্ধুত্বপূর্ণ কমেন্ট, অথবা হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া কোন অবস্থার সৃষ্টি। যেমন-

- উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোন অশোভন/আক্রমাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি না করা।
- উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে কাউকে বৈষম্য বা নিচু করার জন্য নয়।
- কোন শারীরিক / মানসিক ক্ষতি না করে থাকলে।
- কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তির অবস্থার কোন পরিবর্তন না হলে।
- তেমন মারাত্বক ধরনের কিছু নয়, যা কর্মক্ষেত্রে একটি অনাকাঙ্খিত বা অবাঞ্চিত পরিবেশ এর সৃষ্টি করে।

কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা দূরীকরণে চ্যালেঞ্জসমূহ

(১) সহিংসতার ধরণ সম্পর্কে কর্মীদের ধারণা না থাকলে।

(২) ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি এবং অপরাধীর যদি এ ধরনের সহিংসতার আইনগত বিষয়গুলো জানা না থাকে।

(৩) যে ঘটনাগুলো প্রকাশিত করা হয় না ঃ-
- কলঙ্ক চিহ্নিত হবার ভয়ে।
- নিজস্ব কর্মসম্পাদন মূল্যায়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে মনে করে।
- সংস্থার নীতিসমূহ জানা না থাকলে।
- কোথায় বা কার কাছে প্রকাশ করলে ভালো হবে, তা জানা না থাকলে।
- ব্যক্তিগত বিষয় মনে করে চুপ করে থাকলে।
- প্রমাণ করা অসুবিধাজনক বলে মনে হলে।
- কর্মক্ষেত্রে আন্তরিক পরিবেশের অভাব হলে।

(৪) আইনী সুবিধা প্রাপ্তির সুযোগ নাই।

(৫) নীতিসমূহ বাস্তবায়িত হয় না।

(৬) সংস্থা অপরাধীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয় না।-
- যখন কোন সংস্থায় কর্মক্ষেত্রে সহিংসতার কোন নীতি থাকে না বা থাকলেও তার সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন হয় না।
- অপরাধী যখন উচ্চ পদমর্যাদাপূর্ণ / প্রভাবশালী।
- সংস্থার একটি খারাপ ইমেজ হবে মনে করে পদক্ষেপ নেয় না।
- প্রকাশিত / অভিযুক্ত ঘটনাটি বিশ্বাস করে না।
- সংস্থার মধ্যে সীমিত সহায়তা এবং যোগাযোগ থাকলে।
- অভিযুক্ত ঘটনাটি সুপারভাইজারের মাধ্যমে উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি/ব্যবস্থাপকদের কাছে পৌছায় না।

কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা নিরসনে করণীয়

(১) **ম্যানেজার/সুপারভাইজার এর জন্য সমর্থণ ঃ** ম্যানেজার/সুপারভাইজারদের উচ্চ পর্যায় থেকে সহায়তা প্রয়োজন। একজন ব্যবস্থাপকের যখন উচ্চ পর্যায় থেকে সমর্থন থাকে তখন তিনি কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ঘটলে তা সমাধান করতে ফলপ্রসু পদক্ষেপ নিতে পারেন। সুতরাং ম্যানেজার/সুপারভাইজারদের উচ্চ পর্যায়ের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে সুসম্পর্ক থাকা বাঞ্চনীয়।

(২) **নেতৃত্বদানের ক্ষমতা ঃ** একটি দেশের অবস্থার প্রেক্ষাপটে এ ধরনের সহিংসতা দমনে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

(৩) **সংস্থার সমর্থন ঃ** মানবিক অধিকার বিষয়ক উপদেষ্টার মত ব্যক্তি থাকলেই যথেষ্ট নয় যদি না সংস্থার উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের এতে সমর্থন থাকে।

(৪) **পেশাগত দল / সমিতি / ইউনিয়ন এবং রেগুলেটরী সমর্থন ঃ** অভিপ্রেত সুন্দর কর্মপরিবেশ বজায় রাখার জন্য উল্লেখিত বডিগুলো বিভিন্ন ফলপ্রসু পদক্ষেপ নিতে পারে। এর সদস্যদের এ বিষয়ে যথেষ্ট ধারণা থাকা এবং স্পর্শকাতর থাকা প্রয়োজন।

(৫) **সংস্থার নীতিমালা / গাইডলাইন ঃ** একটি সংস্থার এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নীতিমালা / গাইডলাইন থাকা প্রয়োজন (যেমন : (*Zero-tolerance for worplace violence*) এবং এর বাস্তবায়নও দরকার। প্রতিটি কর্মী বা কর্তাবৃন্দের এ বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

(৬) **কার্যকর মনিটরিং ঃ** এটাও এক ধরনের কার্যকর ব্যবস্থা হতে পারে। এই মনিটরিং কর্মসূচীর মধ্যে প্রশিক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধি, কাউন্সিলিং এবং প্রাপ্ত নীতি/গাইডলাইন সম্পর্কে ধারণা প্রদান অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারে।

(৭) **সহায়তাপূর্ণ পরিবেশ / সংস্কৃতি ঃ** একটি সংস্থায় সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দমুলক পরিবেশ গড়ে তোলা যাতে করে ব্যবস্থাপক/সুপারভাইজার এবং কর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকে এবং কর্মী তার সুপারভাইজার এর কাছে স্বাচ্ছন্দে এ বিষয় জানাতে পারে। একুট উম্মুক্ত/স্বচ্ছ পরিবেশ একটি সুন্দর কর্মপরিবেশ/সংস্কৃতি তৈরী করতে পারে।

হ্যান্ডআউট ৪.৫.৩জেন্ডার বান্ধব কর্মক্ষেত্র

কর্মক্ষেত্রে সবসময় একজন নারী/পুরুষ কর্মী সমস্যা দেখিয়ে দেবেন বা অভিযোগ করবেন এমনটি হওয়া উচিত নয়। সমস্যা চিহ্নিত করা, পরিবেশ উপলব্ধি করা এবং সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে একটি সংস্থার উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।

নিয়োগকারী/ব্যবস্থাপক কর্মক্ষেত্রে একটি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ইতিবাচক এবং কার্যকর পদক্ষেপ নেবেন:

- নেটওয়ার্কিং এবং সৌহার্দ্য স্থাপন
- কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষকে আলাদা করে রাখে বা ভিন্নভাবে দেখে এমন কোন স্থান নির্বাচন বা কার্যাবলী না নেয়া। কর্মীরা নিজেদেরকে বৈষম্যের শিকার বা অনাহূত/অবাঞ্চিত বলে ভাবতে পারে।
- সার্বিক আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা
- পদমর্যাদা অনুযায়ী নারী ও পুরুষ কর্মীদেরকে সমভাবে দেখা। যে পর্যায়ের কর্মী হোক না কেন তাদেরকে ‘আপনি’ বলে সম্বোধন করা।

কর্মীর পারিবারিক ভূমিকার কথা চিন্তা করে কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ সৃষ্টি করা

বর্তমানে অধিকহারে নারী ঘরের বাইরে কর্মজীবনে প্রবেশ করছে বলে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ও কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। যদিও নারীরা বাইরে কাজ করে সংসারের আয় রোজগারে অংশগ্রহণ করছে তথাপি গৃহ অভ্যন্তরে এবং পরিবারেও তাদের দায়িত্বসমূহ (সন্তান প্রতিপালন, বয়োজেষ্ঠ্যদের সেবা, সাংসারিক কাজ) তাদের উপরেই বর্তায় এবং তাদের কর্মক্ষেত্রের কর্ম সম্পাদনে এর একটি প্রভাব পড়ে। কর্মক্ষেত্রে যদি একজন নারীর পারিবারিক ভূমিকার স্বীকৃতি দেখা হয়, তাহলে তিনি কর্মস্থলেও সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে তার কার্য সম্পাদন করতে পারবেন।

- একজন কর্মীর পারিবারিক দায়িত্ব পালনের মানে নয় সে যে পেশাগত দায়িত্ব/অংগীকার পালনে সক্ষম নয়
- প্রয়োজনবোধে কর্মক্ষেত্রে বিশেষ কোন কাজে কর্মীর জন্য নমনীয় (Flexible) কর্মঘন্টা নির্ধারণ করা যেতে পারে (যেমন সন্তানকে, বাবা-মাকে বা স্বামী/স্ত্রীকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হলে)
- গর্ভবতী বা ব্রেষ্ট ফিড করানো নারীর জন্য নমণীয় কর্মঘন্টার সংস্থান করা
- কর্মক্ষেত্রে এবং পারিবারিক জীবনে সমন্বয় সাধন করে পেশাগত দায়িত্ব পালন, মিটিং বা অন্যান্য সামাজিক কর্মকান্ডগুলোর সময় নির্ধারন করা।

নিয়োগ, পুনর্বিন্যাস এবং বদলীর ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা বজায় রাখা

একটি সংস্থায় নারী/সংখ্যালঘু দলের সদস্য যদি কম থাকে তাহলে একটি সংস্থায় তাদের নিয়োগ, প্রমোশন, বদলী এবং কর্মীদের কর্মে ধরে রাখার জন্য কৌশল থাকতে হবে। পাবলিক সার্ভিসে জেন্ডার সমতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকার ক্লাস-I এবং ক্লাশ II কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য কোটা পদ্ধতি চালু করেছে। এই কোটার মধ্যে রয়েছে ৪৫% মেধা তালিকা, ৩০% মুক্তিযোদ্ধা বা তাদের সন্তান-সন্তাতি, ১০% নারী, ১০% বিভাগীয় কোটা, ৫% ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য। নার্সিং খাতে এ ব্যবস্থা প্রযোজ্য নয় এবং ব্যাচ অনুযায়ী গ্রাজুয়েট নার্সদেরকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। যাই হোক, নার্স এবং মিডওয়াইফদের নিয়োগ, প্রমোশন ও বদলীর ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা রাখার জন্য অন্যান্য বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। এ কৌশলগুলো হচ্ছেঃ-

- বর্তমানের ৮টি মেডিকেল কলেজের নার্সিং ইনষ্টিটিউগুলোতে ছাত্র ভর্তির জন্য পুরুষ এর জন্য ১০% কোটা বজায় রাখা।
- নিয়োগ, পুনর্বিন্যাস এবং বদলীর জন্য গঠিত কমিটিগুলোতে নারী-পুরুষ এবং সংখ্যালঘু গ্রুপের সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব রাখা
- পাবলিক সার্ভিস রুলস্ অনুযায়ী নিয়োগ এবং ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ায় যেন পেশাগত মান বজায় থাকে এবং অবাঞ্চিত আচরণ এবং প্রশ্ন থেকে মুক্ত থাকে।
- নিয়োগ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে সংস্থার পারিবারিক, অভিভাবকত্ব এবং মাতৃত্বকালীন ছুটিজনিত নীতিসমূহ এবং শিশু যত্ন, কর্মীর সংগী (স্বামী/স্ত্রী) হিসাবে তার বেনিফিট ইত্যাদি ভালোভাবে বিশ্লেষণ করে কর্মীর সামনে তুলে ধরা যাতে করে এ ব্যাপারে তাকে কোনো প্রশ্নের অবতারণা করতে না হয়।
- নিয়োগ পদের পুনর্বিন্যাস এবং বদলীর নীতি, নিয়ম এবং প্রক্রিয়া যেন জেন্ডার রেসপনসিভ হয়।

যে কোন ধরণের জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা থেকে রক্ষা করা। নিয়োগকর্তা কর্মীদেরকে যে কোন ধরণের হয়রানি, সহিংসতা এবং বৈষম্য থেকে রক্ষার জন্য পদক্ষেপ নেবেন, যেগুলো হচ্ছেঃ

- কর্মস্থল যেন অপেশাদারী ভাষা এবং আচরণ এবং যে কোন ধরণের জেন্ডার ভিত্তিক হয়রানি/বৈষম্য মুক্ত থাকে।
- জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা/বৈষম্য দূরীকরণের যে কোন ধরনের নীতি/পদক্ষেপ সমূহ প্রকাশ করা এবং বাস্তবায়ন করা
- রাতের শিফটে কর্মরত বা দেরি করে সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরা নারী কর্মীদের জন্য নিরাপদ এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা

নার্সদের অধিকার রক্ষা এবং তাদের প্রতি “নারীর প্রতি সহিংসতা” জনিত কার্যাবলী থেকে সুরক্ষা করাঃ

- পলিসি/কোড অব কন্ডাক্ট তৈরী এবং বাস্তবায়ন করে নার্সদের অধিকার রক্ষা করা
- অসুবিধাজনক রুগী/ক্লায়েন্টদেরকে মোকাবেলা করার জন্য নার্সদেরকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা দেয়া
- স্বাস্থ্যজনিত সংক্রমণ জটিলতা থেকে নার্সদেরকে রক্ষা করা
- নার্সদের পেশাগত মূল্যবোধ এবং আচরণজনিত দ্বন্দ্ব হতে তাদেরকে রক্ষা করা

জেন্ডার বান্ধব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ

একটি সংস্থায় জেন্ডার বান্ধব কাঠামোগত সুবিধাদি নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যেমনঃ

- নারীদের জন্য আলাদা টয়লেট
- নারীদের জন্য আলাদা নামাজ ঘর
- শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র
- স্বাস্থ্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে নার্সদের জন্য আলাদা পোষাক পাল্টানোর কক্ষ
- স্বাস্থ্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে নার্সদের জন্য নিরাপদ আবাসিক ব্যবস্থা

মেনটরিং এর মাধ্যমে জেন্ডার সাম্যতা প্রতিষ্ঠা করা

পুরুষের প্রাধান্য যে প্রতিষ্ঠাগুলোতে সেখানে মেনটরিং খুব প্রয়োজন। কার্যকরী মেনটরিং হচ্ছে যখন মেনটর নিজেকে শিক্ষক হিসাবে না দেখে সহকর্মী হিসাবে বিবেচনা করে। আনুষ্ঠানিকভাবে মেনটর হিসাবে ঘোষণা না করা হলেও কনিষ্ঠ কর্মীরা জেষ্ঠ্য কর্মীদের সহায়তা কামনা করে, যদিও নার্সিং সেক্টরে বেশীরভাগ কর্মীই নারী। তথাপি একটি সহায়ক এবং সৌহাদ্যপূর্ণ কর্ম পরিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য মেনটরশীপ এর প্রয়োজন রয়েছে।

মেনটরশীপ এর মধ্যে থাকবে-

- সংস্থা সম্পর্কে ধারণা, এর সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এর তথ্য বিনিময়
- পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বিনিময়
- প্রয়োজন অনুযায়ী পরামর্শ, দিক নির্দেশনা প্রদান করা (যদি কেউ আরো লেখাপড়া চালিয়ে যেতে চায় তাহলে পরামর্শ প্রদান করা এবং যদি কেউ কর্মক্ষেত্রে সহিংসতার শিকার হয় তাকে সহায়তা করা)

দায়িত্ব বন্টনে জেন্ডার সাম্য রক্ষা করা

যে সমস্ত সংস্থায় নারী কর্মীর সংখ্যা কম, সেসব স্থানে তাদের মাঝে সুষ্ঠু কর্ম বন্টন করা হয় না। নারীর ভূমিকাজনিত কার্যগুলো তাদের উপর ন্যস্ত করা হয়। এই বিষয়গুলো আরো জেন্ডার অসাম্যতার সৃষ্টি করে এবং ঐ সংস্থায় তাদের পেশাগত উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে।

জেন্ডার সাম্য আসতে পারে-

- কর্মীদের কাছে কোন একটি কাজের সুষ্ঠু সম্পাদন করার জন্য কি প্রয়োজন তা বর্ণনা করা
- কৌশলগত ভাবে নারী কর্মীকে বিভিন্ন কমিটিতে নিয়োজিত করা যাতে করে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়
- প্রতিষ্ঠানের মুখ্য কমিটিগুলো, যেখানে পলিসি নির্ধারিত হয় সেখানে নারী কর্মীকে নিয়োজিত করা
- যে কমিটিগুলোতে জেন্ডার সমতা এবং নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়গুলো আলোচিত হয়, সেখানে নারী কর্মীকে সদস্য হিসাবে রাখা
- একটি মিটিং এর গৌণ কাজগুলো যেমন নোট নেয়া নাস্তার ব্যবস্থা করা, লজিষ্টিক সাপোর্ট ইত্যাদি ধরণের কাজগুলো নারী-পুরুষ কর্মীদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করা

নার্সিং সেক্টরে জেন্ডার সাম্যতার কৌশল নির্ধারণ করা

- ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদ যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পরিচালকের ভূমিকা পালন করতে হয় সেখানে সমান সুযোগ প্রদান করা (যেমন- মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ভর্তি বিষয়ক, নিয়োগ, পদের পুর্নবিন্যাস, প্রমোশন এবং বদলী সংক্রান্ত; সুপারভিশন, মনিটরিং এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোল, পারফরমেন্স এপ্রাইজাল ইত্যাদি)
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণের জন্য গঠিত কমিটিগুলোতে সমান অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা
- ব্যবস্থাপনার যে পদগুলোতে সম্পদ এ প্রবেশাধিকার এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকে সেখানে সংশ্লিষ্ট হবার জন্য সমান অংশগ্রহণ এর সুযোগ
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোতে সমান অংশগ্রহণের সুযোগ
- যে সমস্ত কমিটিতে জেন্ডার সাম্য প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ থাকে, সেখানে সংশ্লিষ্ট হবার সুযোগ

সংস্থার সম্পদে এবং সুযোগ সুবিধায় প্রবেশ এবং বিতরণের ক্ষেত্রে জেন্ডার সাম্যতা নিশ্চিত করা

- বেতন, পেনশন এবং প্রমোশনের ক্ষেত্রে নৈমিত্তিকভাবে এবং সাম্যতা ভিত্তিক পর্যালোচনা করা
- অফিস স্পেস, ইক্যুইপমেন্ট এবং অন্যান্য সুবিধাগুলো বিতরণের ক্ষেত্রে জেন্ডার বিভাজন চিন্তা না করা
- জেন্ডার বিষয়টিকে ভাবনায় না এনে সেক্রেটারীয়াল এবং স্টাফ সাপোর্ট প্রদান করা
- জেন্ডার নয়, মেধার ভিত্তিতে কোন পুরষ্কার বা স্বীকৃতি প্রদানের জন্য মনোনয়ন প্রদান বা পুরষ্কার প্রদান
- জেন্ডার নয় মেধা বা কর্ম সম্পাদনের উপর ভিত্তি করে পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা (যেমন- প্রশিক্ষণ/উচ্চ শিক্ষা)

কর্ম-সম্পাদন এর মূল্যায়ণ করা

একজন কর্মীর জেন্ডার নয় কর্মসম্পাদনের উপর ভিত্তি করে তার মূল্যায়ণ করা উচিত। নারীদেরকে তারা যে পদেই অধিষ্ঠিত থাকুক না কেন তাদের কর্মক্ষেত্রের সমান সদস্য বা সহকর্মী হিসাবে গণ্য করা উচিত। যদিও দেখা যায় যে কর্ম সম্পাদন বিষয়টি জেন্ডার নিরপেক্ষ তথাপি ফলাফল (output) লিখতে গিয়ে জেন্ডার ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া বিচিত্র নয়। (পুরুষ কর্মীর কাজের প্রশংসা করতে গিয়ে বলা হয় ''Brilliant'' ও নারীকে `Nice Lady'' তেমনি একজন নারী যখন দৃঢ় প্রত্যয়ী (Assertive) আচরণ করে তখন তাকে বলা হয় 'অসুবিধাজনক' (Difficult) আবার পুরুষের বেলায় এ ধরনের আচরণকে গণ্যই করা হয় না। নারীরা বলে থাকেন যে, পুরুষের মতো যোগ্যতা অর্জন করতে হলে নারীকে অনেক বেশী দক্ষ হতে হয়। আবার তাদের কাজগুলিকে নারীর কাজের আবরণে মূল্যায়ণ করা হয়।

এখানে জেন্ডার সাম্যতা আনার জন্য প্রয়োজন-

- অদৃশ্যমান জেন্ডার ধারণার বশবর্তী হয়ে নারীর কর্মসম্পাদনকে না দেখার জন্য সঠিক মনযোগ প্রদান করা।
- কর্ম সম্পাদনের উপর ভিত্তি করে নারীর কাজকে মূল্যায়ন করা।